# Sonar Kella by Satyajeet Roy

**For More Books & Muzic Visit www.MurchOna.com**

**suman_ahm@yahoo.com**

www.MurchOna.com

# ফেলুদার রহস্য অ্যাডভেঞ্চার

# সোনার কেল্লা

ফেলুদা হাতের বইটা সশব্দে বন্ধ করে টক্ টক্ দুটো তুড়ি মেরে বিরাট হাই তুলে বলল, 'জিয়োমেট্রি।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'এতক্ষণ কি তুমি জিয়োমেট্রির বই পড়ছিলে?'

বইটায় একটা খবরের কাগজের মলাট দেওয়া, তাই নামটা পড়তে পারিনি। এটা জানি যে, ওটা সিধু জ্যাঠার কাছ থেকে ধার করে আনা। সিধু জ্যাঠার খুব বই কেনার বাতিক, আর বইয়ের খুব যত্ন। সবাইকে বই ধার দেন না, তবে ফেলুদাকে দেন। ফেলুদাও সিধু জ্যাঠার বই বাড়িতে এনেই আগে সেটায় একটা মলাট দিয়ে নেয়।

একটা চারমিনার ধরিয়ে পর পর দুটো ধোঁয়ার রিং ছেড়ে ফেলুদা বলল, 'জিয়োমেট্রির বই বলে আলাদা কিছু নেই। যে-কোনো বই-ই জিয়োমেট্রির বই হতে পারে, কারণ সমস্ত জীবনটাই জিয়োমেট্রি। লক্ষ করলি নিশ্চয়ই—ধোঁয়ার রিংটা যখন আমার মুখ থেকে বেরোল তখন ওটা ছিল পার্ফেক্ট সার্কল। এই সার্কল জিনিসটা কীভাবে ছড়িয়ে আছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সেটা একবার ভেবে দ্যাখ। তোর নিজের শরীরে দ্যাখ। তোর চোখের মণিটা একটা সার্কল। এই সার্কলের সাহায্যে তুই দেখতে পাচ্ছিস আকাশের চাঁদ তারা সূর্য। এগুলোকে ফ্ল্যাটভাবে কল্পনা করলে সার্কল, আসলে গোলক—এক-একটা সলিড বুদ্বুদ, অর্থাৎ জিয়োমেট্রি। সৌরজগতের গ্রহগুলো আবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে এলিপটিক কার্ভে। এখানেও জিয়োমেট্রি। তুই যে একটু আগে জানালা দিয়ে থুক করে রাস্তায় থুতু ফেললি—অবিশ্যি ফেলা উচিত নয়—ওটা আনহাইজিনিক—নেক্সট টাইম ফেললে গাঁট্টা খাবি—ওই থুতুটা গেল কিন্তু একটা প্যারাবোলিক কার্ভে—জিয়োমেট্রি। মাকড়সার জাল জিনিসটা ভালো করে দেখেছিস কখনো? কী জটিল জিয়োমেট্রি রয়েছে তাতে জানিস? একটা সরল চতুষ্কোণ দিয়ে শুরু

হয় জাল বোনা। তারপর সেটাকে দুটো ডায়াগন্যাল টেনে চারটে ত্রিকোণে ভাগ করা হয়। তারপর সেই ডায়াগন্যাল দুটোর ইন্টারসেক্টিং পয়েন্ট থেকে শুরু হয় স্পাইর‍্যাল জাল ; আর সেটাই ক্রমশ বাড়তে বাড়তে পুরো চতুষ্কোণটাকে ছেয়ে ফেলে। ব্যাপারটা এমন তাজ্জব যে ভাবলে কুলকিনারা পাবি না।...'

রবিবারের সকাল। আমরা দু'জনে আমাদের বাড়ির একতলার বৈঠকখানায় বসে আছি। বাবা তাঁর রবিবারের নিয়ম মতো ছেলেবেলার বন্ধু সুবিমল কাকার বাড়িতে আড্ডা মারতে গেছেন। ফেলুদা সোফায় বসে তার পা দুটো সামনের নিচু টেবিলটার উপর তুলে দিয়েছে। আমি বসেছি তক্তপোশে, দেয়ালের সঙ্গে তাকিয়াটা লাগিয়ে তাতে ঠেস দিয়ে। আমার হাতে রয়েছে প্লাস্টিকের তৈরি একটা গোলকধাঁধার ভিতর ছোট্ট লোহার দানা। প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে সেই দানাগুলোকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গোলকধাঁধার মাঝখানে আনবার চেষ্টা করছি। বুঝলাম যে, এ-ও একটা কঠিন জিয়োমেট্রির ব্যাপার।

কাছেই নীহার-পিন্টুদের বাড়িতে পুজোর প্যান্ডেলে 'কাটি পতঙ্গ' ছবির 'ইয়ে জো মহব্বৎ হ্যায়' গানটা বাজছে। গোল গ্রামোফোন রেকর্ডে মিহি স্পাইর‍্যাল প্যাঁচ। অর্থাৎ জিয়োমেট্রি।

'কেবল চোখে দেখা যায় এমন জিনিস না,' ফেলুদা বলে চলল, 'মানুষের মনের ব্যাপারটাও জিয়োমেট্রির সাহায্যে বোঝানো যায়। সাদাসিধে মানুষের মন স্ট্রেট লাইনে চলে ; প্যাঁচালো মন সাপের মতো এঁকেবেঁকে চলে, আবার পাগলের মন যে কখন কোন দিকে চলবে তা কেউ বলতে পারে না—একেবারে জটিল জিয়োমেট্রি।'

ফেলুদার দৌলতে অবিশ্যি আমার সোজা-বাঁকা পাগল-ছাগল অনেক রকম লোকের সঙ্গেই আলাপ হবার সুযোগ হয়েছে। ফেলুদা নিজে কীরকম জ্যামিতিক নকশার মধ্যে পড়ে সেটাই এখন ভাবছিলাম। ওকে জিগ্যেস করাতে বলল, 'একটা মেনি-পয়েন্টেড স্টার বা জ্যোতিষ্ক বলতে পারিস।'

'আর আমি কি সেই জ্যোতিষ্কের স্যাটিলাইট ?'

'তুই একটা বিন্দু যেটাকে অভিধানে বলে পরিমাণহীন স্থাননির্দেশক চিহ্ন।'

আমার নিজেকে স্যাটিলাইট বলে ভাবতে ভালোই লাগে। তবে সব সময় স্যাটিলাইট থাকা সম্ভব হয় না এই যা আপসোস। গ্যাংটকে গণ্ডগোলের ব্যাপারে অবিশ্যি ওর সঙ্গেই ছিলাম, কারণ তখন আমার ছুটি ছিল। তার পরের দুটো তদন্তের ব্যাপারে—একটা ধলভূমগড়ে খুন, আরেকটা পাটনায় একটা জাল উইলের ব্যাপারে—এই দুটোতে আমি বাদ পড়ে গেছি। এখন পুজোর ছুটি। ক'দিন থেকেই ভাবছি এই সময় একটা কেস এলে মন্দ হয় না, কিন্তু সেটা যে সত্যিই এসে পড়বে তা ভাবতে পারিনি। ফেলুদা অবিশ্যি বলে, যে-কোনো





জিনিস মনে মনে খুব জোর দিয়ে চাইলে অনেক সময় আপনা থেকেই এসে পড়ে মোট কথা আজ যেটা ঘটল সেটা আমার এই চাওয়ার ফল বলে ভেবে নিতে আমার কোনো আপত্তি নেই।

পিন্টুদের বাড়ির লাউডস্পীকারে সবেমাত্র 'জনি মেরা নাম'-এর একটা গান দিয়েছে, ফেলুদা অ্যাশ-ট্রেতে ছাই ফেলে হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড কাগজটা হাতে নিয়েছে, আমি একবার রাস্তায় বেরোব কিনা ভাবছি, এমন সময় আমাদের বাইরের দরজার কড়াটা কে যেন সজোরে নেড়ে উঠল। বাবা বারোটার আগে ফিরবেন না, তাই বুঝলাম এ অন্য লোক। দরজা খুলে দেখি ধুতি আর নীল সার্ট পরা একজন নিরীহ গোছের ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন।

'এ বাড়িতে প্রদোষ মিত্তির বলে কেউ থাকেন ?'

লাউডস্পীকারের জন্য প্রশ্নটা করতে ভদ্রলোককে বেশ চেঁচাতে হল। নিজের নাম শুনে ফেলুদা সোফা ছেড়ে দরজার দিকে এগিয়ে এল।

'কোত্থেকে আসছেন ?'

'আজ্ঞে, আমি আসছি সেই শ্যামবাজার থেকে।'

'ভেতরে আসুন।'

ভদ্রলোক ঘরে ঢুকে এলেন।

'বসুন। আমিই প্রদোষ মিত্তির।'

'ওঃ! আপনি এত ইয়ং সেটা আমি ঠিক...'

ভদ্রলোক গদ্গদ ভাব করে সোফার পাশের চেয়ারটায় বসে পড়লেন। তাঁর হাসি কিন্তু বসার পরেই মিলিয়ে গেল।

'কী ব্যাপার ?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

ভদ্রলোক গলা খাঁকরিয়ে বললেন, 'কৈলাস চৌধুরী মশায়ের কাছ থেকে আপনার অনেক সুখ্যাতি শুনেছি। তিনি, মানে, আমার একজন খদ্দের আর কী। আমার নাম সুধীর ধর। আমার একটা বইয়ের দোকান আছে কলেজ স্ট্রীটে—ধর অ্যান্ড কোম্পানি—দেখে থাকতে পারেন হয়ত।'

ফেলুদা ছোট্ট করে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বুঝিয়ে দিল। তারপর আমায় বলল, 'তোপসে—জানলাটা বন্ধ করে দে তো।'

রাস্তার দিকের জানলাটা বন্ধ করতে গানের আওয়াজটা একটু কমল আর তার ফলে ভদ্রলোকও আরেকটু স্বাভাবিকভাবে বাকি কথাগুলো বলতে পারলেন।

'দিন সাতেক আগে খবরের কাগজে একটা খবর বেরিয়েছিল আমার ছেলের বিষয়ে—আপনি কি..., ?'

'কী খবর বলুন তো ?'

'ওই জাতিস্মর...মানে...'

'ওই মুকুল বলে ছেলেটি ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'খবরটা তাহলে সত্যি ?'

'মানে, ও আপনার যে ধরনের কথাবার্তা বলে তাতে তো...'

জাতিস্মর ব্যাপারটা আমি জানতাম। এক-একজন থাকে, তাদের নাকি হঠাৎ পূর্বজন্মের কথা মনে পড়ে যায়। তাদের বলে জাতিস্মর। অবিশ্যি পূর্বজন্ম বলে কিছু আছে কিনা সেটা ফেলুদাও নাকি জানে না।

ফেলুদা চারমিনারের প্যাকেটটা খুলে ভদ্রলোকের দিকে এগিয়ে দিল। ভদ্রলোক একটু হেসে মাথা নেড়ে বুঝিয়ে দিলেন তিনি খান না। তারপর বললেন, 'বোধহয় মনে থাকবে, আমার এই ছেলেটি—আট বছর মাত্র বয়স—একটা জায়গার বর্ণনা দেয়, সেখানে নাকি সে গেছে। অথচ তেমন জায়গায়—আমার ছেলে তো দূরের কথা—আমার বা আমার পূর্বপুরুষদের কারুর কখনো যাবার সৌভাগ্য হয়নি। ছা-পোষা লোক, বুঝতেই তো পারছেন। দোকান দেখি, এদিকে বইয়ের বাজার দিনে দিনে—'

'একটা দুর্গের কথা বলে না আপনার ছেলে ?' ফেলুদা ভদ্রলোককে কতকটা বাধা দিয়েই বলল।

'আজ্ঞে হ্যাঁ। বলে—সোনার কেল্লা। তার মাথায় কামান বসানো আছে, যুদ্ধ হচ্ছে, লোক মরছে—সে সব নাকি সে দেখেছে। সে নিজে পাগড়ি পরে উটের পিঠে চড়ে বালির উপর বেড়াত। বালির কথা খুব বলে। হাতী ঘোড়া এসব অনেক কিছু বলে। আবার ময়ূরের কথা বলে। ওর হাতে একটা দাগ আছে কনুইয়ের কাছে। সেটা জন্মে অবধি আছে। আমরা তো জন্মদাগ বলেই জানতাম। ও বলে যে একবার নাকি একটা ময়ূর ওকে ঠোকর মেরেছিল, এটা নাকি সেই ঠোকরের দাগ।'

'কোথায় থাকত সেটা পরিষ্কার ভাবে বলে ?'

'না—তবে তার বাড়ি থেকে নাকি সোনার কেল্লা দেখা যেত। মাঝে মাঝে কাগজে হিজিবিজি কাটে পেনসিল দিয়ে। বলে—এই দ্যাখো আমার বাড়ি। দেখে তো বাড়ির মতোই মনে হয়।'

'বই-টইয়ের মধ্যে এমন কোনো জায়গার ছবি সে দেখে থাকতে পারে না ? আপনাদের তো বইয়ের দোকান আছে...'

'তা অবিশ্যি পারে। কিন্তু ছবির বই তো অনেক ছেলেই দেখে—তাই বলে কি তারা অষ্টপ্রহর এইভাবে কথা বলে ? আপনি আমার ছেলেকে দেখেননি তাই। সত্যি বলতে কী—তার মনটাই যেন পড়ে আছে অন্য কোথাও। নিজের বাড়ি, নিজের ভাই-বোন বাপ-মা আত্মীয়স্বজন—এর কোনোটাই যেন তার আপন নয়।





আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে কথাই বলে না সে ছেলে।'

'কবে থেকে এইসব বলতে শুরু করেছে ?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

'তা মাস দুয়েক। ওই ছবি আঁকা দিয়েই শুরু জানেন। সেদিন খুব জল হয়েছে, আমি দোকান থেকে সবে ফিরিচি, আর সে আমায় এসে ছবি দেখাচ্ছে। গোড়ায় গা করিনি। ছেলেবয়সে তো কত রকম পাগলামিই থাকে! কানের কাছে ভ্যানর ভ্যানর করেছে, কান পাতিনি। আমার গিন্নীই প্রথম খেয়াল করে। তারপর ক'দিন ধরে তার কথা শুনে-টুনে, তার হাবভাব দেখে, আমার আরেক খদ্দের

আছে—নাম শুনেছেন কি ?—ডাক্তার হেমাঙ্গ হাজরা...'

'হ্যাঁ হ্যাঁ। প্যারাসাইকলজিস্ট। শুনেছি বইকি। তা তিনি তো আপনার ছেলেকে নিয়ে বাইরে কোথায় যাবেন বলে কাগজে বেরিয়েছে।'

'যাবেন না, চলে গেছেন অলরেডি। তিন দিন এলেন আমার বাড়িতে। বললেন, এ তো রাজপুতানার কথা বলছে বলে মনে হচ্ছে। আমি বললুম হতে পারে। শেষটায় বললেন কী, তোমার ছেলে জাতিস্মর ; এই জাতিস্মর নিয়ে আমি রিসার্চ করছি। আমি তোমার ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে রাজপুতানায় যাবো। ঠিক জায়গায় গিয়ে ফেলতে পারলে তোমার ছেলের নিশ্চয়ই আরো অনেক কথা মনে পড়বে। তাতে আমার খুব সুবিধে হবে। ওর খরচাও আমি দেবো, খুব যত্নে রাখব, তোমার কিছু ভাবতে হবে না।'

'তারপর ?' ফেলুদার গলার স্বর আর তার এগিয়ে বসার ভঙ্গিতে বুঝলাম সে বেশ ইন্টারেস্ট পেয়েছে !

'তারপর আর কী—মুকুলকে নিয়ে চলে গেলেন !'

'ছেলে আপত্তি করেনি ?'

ভদ্রলোক একটা শুকনো হাসি হেসে বললেন, 'কোথায় আছেন আপনি ? যেই বললে সোনার কেল্লা দেখাবে অমনি এক কথায় রাজী হয়ে গেল। আপনি তো দেখেননি আমার ছেলেকে। ও, মানে, ঠিক আর পাঁচটা ছেলের মতো নয়। একেবারেই নয়। রাত তিনটের সময় উঠে বসে আছে। গুন-গুন করে গান গাইছে। ফিলিমের গানটান নয় মশাই—গেঁয়ো গেঁয়ো সুর—তবে বাংলাদেশের গাঁ নয় এটা জানি। আমি আবার একটু হারমোনিয়াম-টারমোনিয়াম বাজাই, বুঝেছেন...'

ভদ্রলোক এত কথা বললেন, কিন্তু ফেলুদার কাছে কেন এলেন, গোয়েন্দার কেন প্রয়োজন হতে পারে তাঁর, সেটা এখনো পর্যন্ত কিছুই বললেন না। হঠাৎ ফেলুদার একটা কথাতেই যেন ব্যাপারটা একটা অন্য চেহারা নিয়ে নিল।

'আপনার ছেলে তো কী সব গুপ্তধনের কথা বলছে না ?'

ভদ্রলোক হঠাৎ কেমন যেন মুষড়ে পড়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'সেইখানেই তো গণ্ডগোল মশাই। আমায় বলেছে, কিন্তু কাগজের রিপোর্টারের সামনে কথাটা বলেই তো সর্বনাশ করেছে।'

'কেন, সর্বনাশ বলছেন কেন ?' প্রশ্নটা করেই ফেলুদা আমাদের চাকর শ্রীনাথকে হাঁক দিয়ে চা আনতে বলল।

ভদ্রলোক বললেন, 'কেন, সেটা বুঝতেই পারবেন। গতকাল সকালে তুফান এক্সপ্রেসে হেমাঙ্গবাবু আমার ছেলেকে নিয়ে রাজস্থান রওনা দিয়েছেন, আর—'

ফেলুদা বাধা দিয়ে বলল, 'রাজস্থানের কোন জায়গায় গেছেন সেটা জানেন ?'

সুধীরবাবু বললেন, 'যোধপুর বলেই তো বললেন। বললেন, যখন বালির কথা বলছে, তখন উত্তর-পশ্চিম দিকটা দিয়ে শুরু করব। তা সে যাক গে—এখন কথা হচ্ছে কী, কালই সন্ধ্যায় আমাদের পাড়া থেকে একটি মুকুলের বয়সী ছেলেকে কে বা কারা যেন ধরে নিয়ে যায়।'

'আপনার ধারণা তাকে আপনার ছেলে বলে ভুল করে ?'

'সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই। দুজনের চেহারাতেও বেশ মিল আছে। শিবরতন মুখুজ্যে সলিসিটরের বাড়ি আছে আমাদের পাড়ায়, এটি সে বাড়িরই ছেলে, নাম নীলু, মুখুজ্যে মশায়ের নাতি। তাদের বাড়িতে, বুঝতেই পারছেন, কান্নাকাটি পড়ে গেস্‌ল। পুলিস-টুলিস অনেক হাঙ্গামা। এখন অবিশ্যি তাকে ফিরে পেয়ে সব ঠাণ্ডা।'





'এর মধ্যেই ফেরত দিয়ে দিল ?'

'আজই ভোরে। কিন্তু তাতে কী হল মশাই ! আমার তো এদিকে মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। যারা কিডন্যাপ করেছিল তারা তো বুঝেছে ভুল ছেলে এনেছে। কিন্তু সে ছেলে যে এদিকে তাদের বলে দিয়েছে যে মুকুল যোধপুর গেছে। এখন ধরুন যদি সে গুণ্ডারা গুপ্তধনের লোভে রাজস্থানে ধাওয়া করে তাহলে তো বুঝতেই পারছেন...'

ফেলুদা চুপ করে ভাবছে। তার কপালে চারটে ঢেউ-খেলানো দাগ। আমার বুকের ভিতর টিপটিপানি। সেটা আর কিছু নয়—এই সুযোগে যদি পুজোয় রাজস্থানটা ঘুরে আসা যায়, সেই আশায় আর কী। যোধপুর, চিতোর, উদয়পুর—নামগুলো শুনেছি কেবল, আর ইতিহাসে পড়েছি। আর অবনী ঠাকুরের রাজকাহিনীতে—যেটা আমার নরেশ কাকা আমাকে জন্মদিনে দেয়।

শ্রীনাথ চা এনে রাখল টেবিলের উপর। ফেলুদা সুধীরবাবুর দিকে একটা পেয়ালা এগিয়ে দিলেন। ভদ্রলোক এবার একটা কিন্তু-কিন্তু ভাব করে বললেন, 'আপনার বিষয় কৈলাস বাবু যা বলেছিলেন, তাতে তো আপনাকে খুবই ইয়ে বলে মনে হয়। তাই ভাবছিলুম, যদি ধরুন, আপনি যদি রাজস্থানটা যেতে পারতেন। অবিশ্যি গিয়ে যদি দেখেন ওরা নিরাপদে আছে, তাহলে তো কথাই নেই। কিন্তু যদি ধরুন গিয়ে কিছু গোলমাল দেখেন ! মানে, আপনার সাহসের কথাও অনেক শুনিচি। অবিশ্যি আমি নেহাত ছা-পোষা লোক। আপনার কাছে আসাটাই আমার পক্ষে একটা ধৃষ্টতা। কিন্তু যদি ধরুন আপনি যেতে রাজীই হন, তাহলে আপনার, মানে, যাতায়াতের খরচটা আমি আপনাকে নিশ্চয়ই দেবো।'

ফেলুদা কপালে ভ্রূকুটি নিয়ে আরো অন্তত মিনিট খানেক ওইভাবে চুপ করে বসে রইল। তারপর বলল, 'আমি কী স্থির করি সেটা আপনাকে কাল জানাব। আপনার ছেলের একটা ছবি বাড়িতে আছে নিশ্চয়ই ? কাগজে যেটা বেরিয়েছিল সেটা তেমন স্পষ্ট নয়।'

সুধীরবাবু চায়ে একটা বড় রকম চুমুক দিয়ে বললেন, 'আমার খুড়তুতো ভাই ছবিটবি তোলে—সে একটা তুলেছিল মুকুলের ছবি। আমার গিন্নীর কাছে আছে।'

'ঠিক আছে।'

ভদ্রলোক বাকি চা-টা শেষ করে হাত থেকে কাপ রেখে উঠে পড়লেন।

'আমার দোকানে অবিশ্যি টেলিফোন আছে—৩৪-৫১১৬। দশটা থেকে আমি দোকানে থাকি।'

'আপনি এমনিতে থাকেন কোথায় ?'

'মেছোবাজার। সাত নম্বর মেছোবাজার স্ট্রীট। মেন রোডের উপরেই।'

ভদ্রলোক চলে যাবার পর দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ফেলুদাকে বললাম, 'আচ্ছা, একটা কথার কিন্তু মানে বুঝতে পারলাম না !'

'প্যারাসাইকলজিস্ট তো ?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ ।'

ফেলুদা বলল, 'মানুষের মনের কতগুলো বিশেষ ধরনের ধোঁয়াটে দিক নিয়ে যারা চর্চা করে তাদের বলে প্যারাসাইকলজিস্ট । যেমন টেলিপ্যাথি । একজন লোক আরেকজন লোকের মনের কথা জেনে ফেলল । কিংবা নিজের মনের জোরে আরেকজনের চিন্তার মোড় ঘুরিয়ে দিল । অনেক সময় এমন হয় যে, তুই ঘরে বসে আছিস, হঠাৎ একজন পুরানো বন্ধুর কথা মনে পড়ল—আর ঠিক সেই মুহূর্তেই সে বন্ধু তোকে টেলিফোন করল । প্যারাসাইকলজিস্টরা বলে যে ব্যাপারটা আকস্মিক নয় । এর পেছনে আছে টেলিপ্যাথি । আরো আছে । যেমন এক্সট্রা সেন্সরি-পারসেপশন—যাকে সংক্ষেপে বলে ই এস্ পি । ভবিষ্যতে কী ঘটতে যাচ্ছে সেটা আগে থেকে জেনে ফেলা । বা এই যে জাতিস্মর—পূর্বজন্মের কথা মনে পড়ে যাওয়া । এগুলো সবই হচ্ছে প্যারাসাইকলজিস্টদের গবেষণার বিষয় ।'

'এই হেমাঙ্গ হাজরা বুঝি খুব বড় প্যারাসাইকলজিস্ট ?'

'যে ক'টি আছেন, তাদের মধ্যে তো বেশ নামকরা বলেই জানি । বিদেশে-টিদেশে গেছেন, লেকচার-টেকচার দিয়েছেন,বোধ হয় একটা সোসাইটিও করেছেন ।'

'তোমার এসব জিনিসে বিশ্বাস হয় বুঝি ?'

'আমি যেটা বিশ্বাস করি সেটা হল এই যে, প্রমাণ ছাড়া কোনো জিনিস বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করাটা বোকামো । মনটা খোলা না রাখলে যে মানুষকে বোকা বনতে হয়, তার প্রমাণ ইতিহাসে অজস্র আছে । এককালে লোকে পৃথিবীটা ফ্ল্যাট বলে মনে করত জানিস ? আর ভাবত যে একটা জায়গায় গিয়ে পৃথিবীটা ফুরিয়ে গেছে, যার পর আর যাওয়া যায় না । কিন্তু ভূপর্যটক ম্যাগেলান যখন এক জায়গা থেকে রওনা হয়ে ভূপ্রদক্ষিণ করে আবার সেই জায়গাতেই ফিরে এলেন, তখন ফ্ল্যাটওয়ালারা সব মাথা চুলকোতে লাগলেন । আবার লোকে এটাও বিশ্বাস করেছে যে, পৃথিবীটাই স্থির, গ্রহ-নক্ষত্র-সূর্য তাকে প্রদক্ষিণ করছে । এক সময় একদল আবার ভাবত যে, আকাশটা বুঝি একটা বিরাট উপুড়-করা বাটি, যার গায়ে তারাগুলো সব মণিমুক্তোর মতো বসানো আছে । কোপারনিকাস প্রমাণ করলেন যে সূর্যই স্থির,আর সূর্যকে ঘিরেই পৃথিবী সমেত সৌরজগতের সব কিছু ঘুরছে । কিন্তু কোপারনিকাস ভেবেছিলেন যে, এই ঘোরাটা বুঝি বৃত্তাকারে । কেপলার এসে প্রমাণ করলেন ঘোরাটা আসলে এলিপটিক কক্ষে । তারপর আবার





গ্যালিলিও...যাক গে, তোকে এত জ্ঞান দিয়ে লাভ নেই । তোর নাবালক মস্তিষ্কে এসব ঢুকবে না ।'

ফেলুদা এতবড় গোয়েন্দা হয়েও বুঝতে পারল না যে আমাকে এখন খোঁচা-টোঁচা দিয়ে আমার ফুর্তিটা মাটি করা সহজ হবে না, কারণ আমার মন অলরেডি বলছে যে এবার ছুটিটা রাজস্থানেই কাটবে, আর নতুন দেশ দেখার সঙ্গে সঙ্গে চলবে নতুন রহস্যের জট ছাড়ানো । দেখা যাক আমার টেলিপ্যাথির দৌড় কদ্দূর !

## ॥ ২ ॥

ফেলুদা যদিও একদিন সময় চেয়েছিল, সুধীরবাবু চলে যাওয়ার এক ঘণ্টার মধ্যেই ও রাজস্থান যাওয়া ঠিক করে ফেলল । কথাটা আমাকে বলতে আমি বললাম, 'যাচ্ছি তো ?'

ফেলুদা বলল, 'এক মিনিটের মধ্যে রাজস্থানের পাঁচটা কেল্লাওয়ালা শহরের নাম করতে পারলে চান্স আছে ।'

'যোধপুর, জয়পুর, চিতোর, বিকানির আর...আর...বুঁদির কেল্লা !'

রিস্টওয়াচের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে নিয়ে তড়াক করে সোফা থেকে উঠে পড়ে সাড়ে তিন মিনিটের মধ্যে পায়জামা পাঞ্জাবি ছেড়ে প্যান্ট-সার্ট পরে নিয়ে ফেলুদা বলল, 'আজ রোববার—দুটো পর্যন্ত ফেয়ারলি প্লেস খোলা—চট করে রিজার্ভেশনটা করে আসি ।'

একটার মধ্যে ফেলুদা কাজ সেরে বাড়ি ফিরে এসে প্রথমেই ডিরেক্টরি খুলে নম্বর বার করে ডক্টর হেমাঙ্গ হাজরার বাড়িতে একটা টেলিফোন করল । যে লোকটা নেই, তাকে ফোন করা হচ্ছে কেন জিজ্ঞেস করাতে বলল, 'সুধীরবাবু লোকটা সত্যি কথা বলেছে কিনা সেটার প্রমাণের দরকার ছিল ।'

'পেলে প্রমাণ ?'

'হ্যাঁ ।'

দুপুরবেলাটা ফেলুদা বুকের তলায় বালিশ নিয়ে উপুড় হয়ে তার খাটে শুয়ে এক সঙ্গে পাঁচখানা বই ঘাঁটাঘাঁটি করল । দুটো বই পেলিক্যানের—সেগুলো প্যারাসাইকলজি সম্বন্ধে । এগুলো নাকি ফেলুদা তার কলেজের পুরানো বন্ধু অনুতোষ বটব্যালের কাছ থেকে ধার করে এনেছে । অন্য তিনটের মধ্যে একটা হল টড সাহেবের লেখা রাজস্থানের বই, আরেকটা হল গাইড টু ইন্ডিয়া, পাকিস্তান, বার্মা অ্যান্ড সিলোন, আর আরেকটা হল ভারতবর্ষের ইতিহাস, কার লেখা ভুলে গেছি ।

বিকেলে চা খাবার পর ফেলুদা বলল, 'তৈরি হয়ে নে। একবার সুধীরবাবুর বাড়ি যাওয়া দরকার।'

এখানে বলে রাখি যে, বাবাকে রাজস্থান যাচ্ছি বলাতে উনি খুব খুশি হলেন। উনি নিজে দাদুর সঙ্গে ছেলেবেলায় দু'বার রাজস্থান ঘুরে এসেছেন। বললেন, 'চিতোরটা মিস করিস না। চিতোরের কেল্লা দেখলে গায়ে কাঁটা দেয়। রাজপুতরা যে কত বড় বীর যোদ্ধা ছিল সেটা তাদের চেহারা দেখলেই বোঝা যায়।'

সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা নাগাদ আমরা সাত নম্বর মেছোবাজার স্ট্রীটে গিয়ে হাজির হলাম। ফেলুদা যেতে রাজী হয়েছে শুনে সুধীরবাবুর মুখে আবার সেই গদ্‌গদ ভাব ফুটে উঠল।

'কী বলে যে কৃতজ্ঞতা জানাবো আপনাকে তা বুঝতে পারছি না।'

ফেলুদা বলল, 'এখনো সেটার প্রয়োজন আসেনি সুধীরবাবু। এখন ধরে নিন আমরা এমনি বেড়াতে যাচ্ছি, আপনার অনুরোধে যাচ্ছি না!'

'সময় খুব কম। আমরা কালই রওনা হচ্ছি। কিন্তু তার আগে দুটো কাজ আছে। এক হচ্ছে—আপনার ছেলের একটা ছবি চাই। আর দুই—যদি সম্ভব হয়, তাহলে সেই নীলু ছেলেটির সঙ্গে একবার দেখা করব—সেই যাকে কিডন্যাপ করেছিল।'

সুধীরবাবু বললেন, 'এমনিতে সে ছেলে বিকেলে বাড়িতে থাকে না। তাছাড়া পুজোর বাজার, বুঝতেই তো পারছেন। তবে আজ বোধহয় তাকে আর বেরোতে দেবে না। দাঁড়ান, আগে ছবিটা এনে দিই আপনাকে।'

সুধীরবাবুর বাড়ির তিনটে বাড়ি পরে একই ফুটপাথে হল সলিসিটার শিবরতন মুখার্জির বাড়ি। ভদ্রলোক বাড়িতেই ছিলেন; সামনে বৈঠকখানায় তক্তপোশে একজন মুখে শ্বেতীর দাগওয়ালা লোকের সঙ্গে বসে চা খাচ্ছিলেন। সুধীরবাবুর কথা শুনে বললেন, 'আপনার ছেলের দৌলতে আমার নাতিরও যে খ্যাতি বেড়ে



শিবরতনবাবু বললেন, 'নীলুকে আমরাও অনেক কিছু জিজ্ঞেস-টিজ্ঞেস করেছি। গোড়ার দিকে তো কথাই বলছিল না; নার্ভাস শকে গুম মেরে গিয়েছিল। বিকেলের দিক থেকে একটু নরম্যাল মনে হচ্ছে।'

'পুলিসে খবর দেওয়া হয়নি?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

'ধরে নিয়ে যাবার পর দেওয়া হয়েছিল। তবে তারা কিছু করবার আগেই তো দেখছি ফেরত এসে গেল।'

এইবার নীলু ছেলেটি এসে চাকরের সঙ্গে ঘরে ঢুকল। সত্যিই, ছবিতে মুকুলের যে চেহারা দেখছি, তার সঙ্গে বেশ মিল আছে। দেখে বেশ বোঝা যাচ্ছে

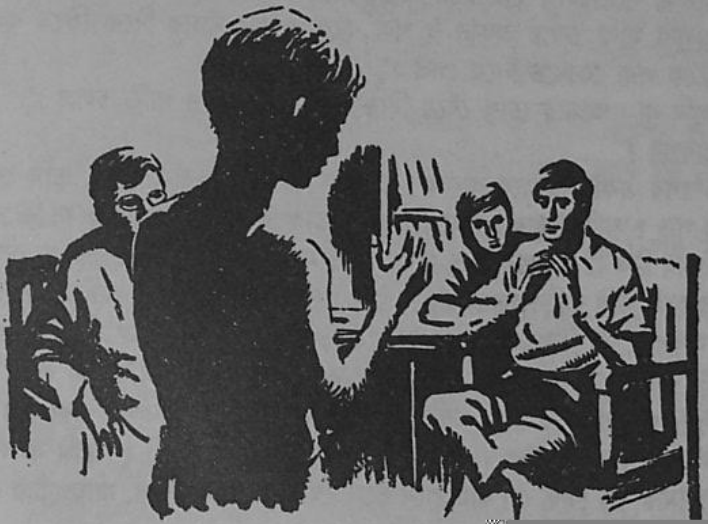

নিয়ে গাড়িতে উঠল। আর আরেকজন তো গাড়ি চালালো। আমার খুব ভয় করছিল।'

'আমারও ভয় করত', ফেলুদা বলল, 'তোমার চেয়েও বেশি। তুমি খুব সাহসী। তা তোমাকে যখন ধরল, তখন তুমি কী করছিলে?'

'আমি ঠাকুর দেখতে যাচ্ছিলাম। মতিদের বাড়িতে পুজো হয়। মতি আমার ক্লাসে পড়ে।'

'রাস্তায় তখন বেশি লোকজন ছিল না বুঝি?'

শিবরতনবাবু বললেন, 'এদিকটায় পরশু একটা গোলমাল হয়ে গেছে। বোমাটোমা পড়েছিল। তাই কাল সন্ধের দিকে লোক চলাচলটা একটু কমেছে।'

ফেলুদা মাথা নেড়ে একটা হুঁ শব্দ করে আবার নীলুর দিকে ফিরে বলল, 'তোমাকে ওরা কোথায় নিয়ে গেল?'

'জানি না। আমার চোখ বেঁধে দিয়েছিল। অনেকক্ষণ গাড়ি চলল।'

'তারপর?'

'তারপর একটা চেয়ারে বসাল। তারপর বসিয়ে একজন বলল, তুমি কোন ইস্কুলে পড়? আমি ইস্কুলের নাম বললাম। তারপর বলল, 'তোমাকে যা জিজ্ঞেস করছি তার ঠিক ঠিক উত্তর দাও, তাহলে তোমার ইস্কুলের সামনে নামিয়ে দেবো, আর তাহলে তুমি বাড়ি যেতে পারবে তো? আমি বললাম, হ্যাঁ পারব। তারপর আমি বললাম, কী জিজ্ঞেস করবে তাড়াতাড়ি কর, দেরি হলে মা বকবে। তখন লোকটা বলল, সোনার কেল্লা কোথায়? তখন আমি বললাম, আমি জানি না, আর মুকুলও জানে না; ও খালি সোনার কেল্লা জানে। তখন ওরা সব কী ইংরিজিতে বলল, মিসটেক। তারপর বলল, তোমার নাম কী? আমি বললাম, মুকুল আমার বন্ধু কিন্তু সে রাজস্থানে চলে গেছে। তখন বলল, জায়গাটার নাম তুমি জান? আমি বললাম, জয়পুর।'

'জয়পুর বললে?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

'না না, যোধপুর। হ্যাঁ, যোধপুর বললাম।'

নীলু একটু থামল। আমরাও সকলে চুপ। চাকর চা আর মিষ্টি এনে রেখে গেছে, কিন্তু কারুরই সে দিকে দৃষ্টি নেই। ফেলুদা বলল, 'আর কিছু মনে পড়ছে?'

নীলু একটু ভেবে বলল, 'একজন লোক সিগারেট খাচ্ছিল। না না, চুরুট।'

'তুমি চুরুটের গন্ধ জান?'

'আমার মেসোমশাই খায় যে।'

'সেই রাত্রে তুমি ঘুমোলে কোথায়?' ফেলুদা প্রশ্ন করল।

নীলু বলল, 'জানি না তো।'





'জান না? জান না মানে?'

'আমাকে একবার বলল, দুধ খাও। তারপর একটা খুব ভারী গেলাসে দুধ দিল আর আমি খেলাম। আর তারপর তো আমি ঘুমিয়ে পড়লাম বসে বসেই।'

'তারপর? ঘুম ভাঙল কখন?'

নীলু একটু বেচারা-বেচারা ভাব করে শিবরতনবাবুর দিকে তাকাল। শিবরতনবাবু হেসে বললেন, 'ওর ঘুম ভাঙে বাড়িতে আসার পর। ওকে ওর স্কুলের সামনে ফেলে দিয়ে গিয়েছিল। তখন ও ঘুমন্ত। বোধহয় ভোর রাত্রের দিকে। তারপর আমাদের বাড়িতে যে লোকটা খবরের কাগজ দেয়, সে ভোরে সাইকেল করে ওখান দিয়ে যাবার সময় দেখতে পায়। ও-ই এসে আমাদের বাড়িতে খবর দেয়। তারপর আমি আর আমার ছেলে গিয়ে ওকে নিয়ে আসি। ডাক্তার বললে যে, কোনো ঘুমের ওষুধ একটু হেভি ডোজে খাইয়ে দিয়েছিল আর কি।'

ফেলুদা গম্ভীর। চায়ের পেয়ালাটা তুলে নিয়ে চাপা গলায় একবার শুধু বলল, 'স্কাউন্ড্রেলস্!' তারপর নীলুকে পিঠ চাপড়িয়ে দিয়ে বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ নীলুবাবু। এবার তুমি যেতে পার।'

শিবরতনবাবুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রাস্তায় বেরোবার পর সুধীরবাবু বললেন, 'চিন্তার কারণ আছে বলে মনে করছেন কি?'

ফেলুদা বলল, 'কয়েকজন অত্যন্ত লোভী এবং বেপরোয়া লোক যে আপনার ছেলের ব্যাপারে একটু বেশি মাত্রায় কৌতূহলী হয়ে পড়েছে সে তো দেখতেই পাচ্ছি। তবে তারা রাজস্থান পর্যন্ত যাবে কিনা সেটা বলা মুশকিল। ভালো কথা, আপনি বরং আমাকে একটা চিঠি দিয়ে দিন। ডক্টর হাজরা তো আর আমাকে চেনেন না। আপনি আমাকে ইনট্রোডিউস করে দিলে সুবিধে হবে।'

চিঠিটা দেবার পর সুধীরবাবু আরেকবার ফেলুদাকে রাজস্থানের ভাড়াটা অফার করলেন। ফেলুদা তাতে কানই দিল না। বাসস্টপের কাছাকাছি এসে ভদ্রলোক বললেন, 'গিয়ে অন্তত একটা খবর দেবেন স্যার। বড্ড চিন্তায় থাকব। অবিশ্যি ডাক্তারবাবু লিখবেন চিঠি, নিজেই কথা দিয়েছেন। কিন্তু যদি নাও লেখেন, আপনি অন্তত একখানা...'

বাড়িতে ফিরে এসে গোছগাছ করার আগে ফেলুদা তার বিখ্যাত নীল খাতা ভলিউম সিক্স খুলে খাটে বসে বলল, 'কতগুলো তারিখের হিসেব বল তো দেখি—লিখে নি। ডক্টর হাজরা মুকুলকে নিয়ে রাজস্থান রওনা হয়েছেন কবে?'

'গতকাল ৯ই অক্টোবর।'

'নীলুকে কিডন্যাপ করেছিল কবে?'

'কালই। সন্ধেবেলা।'

'ফেরত দিয়েছে আজ সকালে, অর্থাৎ ১০ই। আমরা রওনা হচ্ছি কাল ১১ই সকালে। আগ্রা পৌঁছাব ১২ই। সেদিনই বিকেলে ট্রেনে চড়ে সেদিনই রাত্রে পৌঁছাব বান্দিকুই। বান্দিকুই থেকে রাত ১২টায় গাড়ি, মারওয়াড় পৌঁছাব সেদিনই—অর্থাৎ ১৩ই সন্ধ্যাবেলা, ১৩ই...১৩ই...'

এইভাবে ফেলুদা কিছুক্ষণ আপন মনে বিড়বিড় করে কী জানি ক্যালকুলেট করল। তারপর বলল, 'জিয়োমেট্রি। এখানেও জিয়োমেট্রি। একটা বিন্দু—সেই বিন্দুর দিকে কনভার্জ করছে কতগুলো লাইন। জিয়োমেট্রি...'

॥ ৩ ॥

আমরা আধঘন্টা হল আগ্রা ফোর্ট স্টেশন থেকে বান্দিকুইয়ের ট্রেনে চেপেছি। আগ্রায় হাতে তিন ঘণ্টা সময় ছিল। সেই ফাঁকে দশ বছর বাদে আরেকবার তাজমহলটা দেখে নিলাম, আর ফেলুদাও আমাকে তাজের জিয়োমেট্রি সম্পর্কে একটা ছোটখাট লেকচার দিয়ে দিল।

গতকাল কলকাতা ছাড়ার আগে একটা জরুরী কাজ সেরে নিয়েছিলাম—[illegible] এখানে বলে রাখি। তুফান এক্সপ্রেস ছাড়বে সকাল



নারায়ণকে হাঁক দিয়ে বলো চা দেবে।'

একটা তক্তপোশ, দুটো চেয়ার, আর ইয়া বড় বড় তিনটে বইয়ের আলমারি ছাড়া ঘরে আর কিছু নেই। তক্তপোশটারও অর্ধেকটা বইয়ে বোঝাই। আমরা জানতাম ওই খালি জায়গাটাই সিধু জ্যাঠার জায়গা, তাই আমরা চেয়ার দুটোতে বসলাম। ফেলুদা তার ধার-করা মলাট দেওয়া বইটা সঙ্গে এনেছিল, সেটা একটা আলমারির একটা তাকের ফাঁকে গুঁজে দিল।

চুল কাটতে কাটতেই সিধু জ্যাঠা বললেন, 'ফেলু যে গোয়েন্দাগিরি করছ, ক্রিমিন্যাল ইনভেসটিগেশনের ইতিহাসটা একবার ভালো করে পড়ে নিয়েছ তো? যে কাজেই স্পেশালাইজ কর না কেন, তার ইতিহাসটা জানা থাকলে কাজে আনন্দ আর কনফিডেন্স দুটোই পাবে বেশি।'

ফেলুদা নরম সুরে বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, তা তো বটেই।'

'এই যে আঙুলের ছাপ দেখে ক্রিমিন্যাল ধরার পদ্ধতি, এটার আবিষ্কর্তা কে জান?'

ফেলুদা আমার দিকে চোখ টিপে বলল, 'ঠিক মনে পড়ছে না; পড়েছিলাম বোধহয়।'

'তাই বুঝি ?' ফেলুদা বুঝেছে যে একটা ইন্টারেস্টিং খবরের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

'সে জান না বুঝি ? বছর চারেক আগের ব্যাপার। কাগজে বেরিয়েছিল তো। শিকাগোতে এক বাঙালী ভদ্রলোক—ভদ্র আর বলি কী করে, চরম ছোটলোক—এক আধ্যাত্মিক চিকিৎসালয় খুলে বসেছিল। খাস শিকাগো শহরে। তরতর করে আমেরিকান খদ্দের জুটে যায়, বুঝেছ। হুজুগে জাত তো, আর পয়সা অঢেল। হিপ্‌নটিজম অ্যাপ্লাই করে দুরারোগ্য ব্যাধি সারিয়ে দেবো বলে ক্লেম করেছিল। এইটিনথ্ সেঞ্চুরিতে ইউরোপে আনটন মেসমার যা করে। এর বেলা দু-একটা ছুটছাট লেগেও গিয়েছিল বোধহয়—যেমন হয় আর কী। সেই সময় হাজরা শিকাগোতে বক্তৃতা দিতে যায়। সে জানতে পেরে ব্যাপারটা চাক্ষুষ করতে যায় ; গিয়ে ভণ্ডামি ধরে ফেলে। সে এক স্ক্যান্ডাল। শেষ পর্যন্ত লোকটাকে দেশছাড়া করে ছেড়েছিল আমেরিকান সরকার। হ্যাঁ হ্যাঁ—নাম নিয়েছিল ভবানন্দ,...হাজরা খুব সলিড লোক। অন্তত লেখাটেখা পড়ে তো তাই মনে হয়। খান দুয়েক লেখা তো আমার কাছেই রয়েছে। বাঁ দিকের আলমারির তলার তাকে ডান কোণে দেখ তো। প্যারাসাইকলজিক্যাল সোসাইটির তিনখানা জার্নাল পাবে...'

ফেলুদা ম্যাগাজিন তিনটে ধার করে নেয়। এখন ট্রেনে বসে ও সেগুলোই উল্টেপাল্টে দেখছে। আমি জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখছি। উত্তর প্রদেশ পেরিয়ে রাজস্থানে ঢুকেছি কিছুক্ষণ আগেই।

'এখানে রোদের তেজই আলাদা। সাধে কী আর লোকগুলো এত পাওয়ারফুল !'

কথাটা এল আমাদের সামনের বেঞ্চি থেকে। ফোর-বার্থ কম্পার্টমেন্ট, আর যাত্রীও আছি সবসুদ্ধ চারজন। যিনি কথাটা বললেন তিনি দেখতে অত্যন্ত নিরীহ, রীতিমত রোগা, আর হাইটে নির্ঘাত আমার চেয়েও অন্তত দু' ইঞ্চি কম। আমার তো তাও বয়স মাত্র পনেরো, তাই বাড়ার বয়স যায়নি। ইনি কমপক্ষে পঁয়ত্রিশ, কাজেই যেমন আছেন তেমনই থাকবেন। ইনি যে বাঙালী সেটা এতক্ষণ বুঝতে পারিনি, কারণ বুশ সার্ট আর প্যান্ট থেকে বোঝা খুব শক্ত। ভদ্রলোক ফেলুদার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললেন, 'অনেকক্ষণ থেকে আপনাদের কথা শুনচি। দূর দেশে এসে জাতভাইয়ের সাক্ষাৎ পাওয়া কি কম সৌভাগ্যের কথা ? আমি তো ধরেই নিয়েছিলুম এই একটা মাস মাতৃভাষাটাকে একরকম বাধ্য হয়েই বয়কট করতে হবে।'

ফেলুদা হয়ত খানিকটা ভদ্রতার খাতিরেই জিজ্ঞেস করল, 'কদ্দূর যাবেন ?'

'যোধপুরটা তো পৌঁছই, তারপর দেখা যাবে। আপনারা ?'





'আমরাও আপাতত যোধপুর।'

'বাঃ—চমৎকার হল। আপনিও কি লেখেন-টেখেন নাকি ?'

'আজ্ঞে না।' ফেলুদা হাসল। 'আমি পড়ি। আপনি লেখেন ?'

'জটায়ু নামটা চেনা লাগচে কি ?'

'জটায়ু ? সেই যে সব রোমহর্ষক অ্যাডভেঞ্চার উপন্যাস লেখেন ? আমি তো পড়েওছি তার দু-একটা বই— সাহারায় শিহরন, দুর্ধর্ষ দুশমন —আমাদের স্কুলের লাইব্রেরি থেকে নিয়ে।

'আপনিই জটায়ু ?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

'আজ্ঞে হ্যাঁ'—ভদ্রলোকের দাঁত বেরিয়ে গেল, ঘাড় নুয়ে পড়ল—'এই অধমের ছদ্মনামই জটায়ু। নমস্কার।'

'নমস্কার। আমার নাম প্রদোষ মিত্তির। ইনি শ্রীমান তপেশরঞ্জন।'

ফেলুদা হাসি চেপে রেখেছে কী করে ? আমার তো সেই যাকে বলে পেট থেকে ভসভসিয়ে সোডার মতো হাসি গলা অবধি উঠে এসেছে। ইনিই জটায়ু ! আর আমি ভাবতাম, যেরকম গল্প লেখেন,চেহারা নিশ্চয়ই হবে একেবারে জেম্স বন্ডের বাবা।

'আমার আসল নাম লালমোহন গাঙ্গুলী। অবিশ্যি বলবেন না কাউকে। ছদ্মনামটা, মানে, ছদ্মবেশের মতোই–ধরা পড়ে গেলে তার আর কোনো ইয়ে থাকে না।'

আমরা আগ্রা থেকে কিছু গুলাবী রেউড়ি নিয়ে এসেছিলাম, ফেলুদা ঠোঙাটা ভদ্রলোকের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'আপনি তো বেশ কিছুদিন থেকেই ঘুরছেন বলে মনে হচ্ছে।'

ভদ্রলোক 'হ্যাঁ, তা—' বলে একটা রেউড়ি তুলে নিয়েই কেমন যেন থতমত খেয়ে গেলেন। ফেলুদার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে বললেন, 'আপনি জানলেন কী করে ?'

ফেলুদা হেসে বললেন, 'আপনার ঘড়ির ব্যান্ডের তলা দিয়ে আপনার গায়ের চামড়ার রোদে-না-পোড়া আসল রংটা মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়ছে।'

ভদ্রলোক চোখ গোল গোল করে বললেন, 'ওরেব্বাস্‌রে, আপনার তো ভয়ঙ্কর অবজারভেশন মশাই। ঠিকই ধরেছেন দিল্লী, আগ্রা, ফতেপুর সিক্রি—এইসব একটু ঘুরে দেখলুম আর কী। দিন দশেক হল বেরিয়েচি। অ্যাদ্দিন স্রেফ বাড়িতে বসে বসে দেশ-বিদেশের গপ্পো লিখিচি। থাকি ভদ্রেশ্বরে।এবার তাই ভাবলুম—একটু ঘুরে দেখা যাক, লেখার সুবিধে হবে। আর অ্যাডভেঞ্চারের গপ্পো এইসব দিকেই জমে ভালো, বলুন ! দেখুন না কীরকম সব রুক্ষ পাহাড়, বাইসেপ-ট্রাইসেপের মতো ফুলে ফুলে রয়েছে !

বাংলাদেশের—এক হিমালয় ছাড়া—মাস্‌ল নেই মশাই। সমতলভূমিতে কি অ্যাডভেঞ্চার জমে ?'

আমরা তিনজনে রেউড়ি খেতে লাগলাম। জটায়ু দেখি মাঝে মাঝে আড়চোখে ফেলুদার দিকে দেখছেন। শেষটায় বললেন, 'আপনার হাইট কত মশাই ? কিছু মনে করবেন না।'

'প্রায় ছয়', ফেলুদা বলল।

'ওঃ, দারুণ হাইট। আমার হিরোকেও আমি ছয় করিচি। প্রখর রুদ্র—জানেন তো ? রাশিয়ান নাম—প্রখর, কিন্তু বাঙালীকেও কিরকম মানিয়ে গেছে বলুন ! আসলে নিজে যা হতে পারলুম না, বুঝেছেন, হিরোদের মধ্যে দিয়ে সেই সব আশ মিটিয়ে নিচ্চি। কম চেষ্টা করিচি মশাই হবার জন্যে ? সেই কলেজে থাকতে চার্লস অ্যাটলাসের বিজ্ঞাপন দেখতুম বিলিতি ম্যাগাজিনে। বুক চিতিয়ে মাস্‌ল ফুলিয়ে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কী হাতের গুলি, কী বুকের ছাতি, কোমরখানা একেবারে সিংহের মতো। চর্বি নেই এক ফোঁটা সারা শরীরে। মাথা থেকে পা অবধি ঢেউ খেলে গেছে মাস্‌লের। বলছে—একমাসের মধ্যে আমার মতো চেহারা হয়ে যাবে, আমার সিস্টেম ফলো করে। ওদের দেশে হতে পারে মশাই। বাংলাদেশে ইমপসিব্‌ল। বাপের পয়সা ছিল, কিছু নষ্ট করলুম, লেসন আনালুম, ফলো করলুম—কিস্যু হল না। যেই কে সেই। মামা বললেন—পর্দার রড ধরে ঝুলবি রোজ, দেখবি একমাসের মধ্যে হাইট বেড়ে যাবে। কোথায় একমাস ! ঝুলতে ঝুলতে একদিন মশাই রড সুদ্ধু খসে মাটিতে পড়ে হাঁটুর হাড় ডিসলোকেট হয়ে গেল, অথচ আমি সেই পাঁচ সাড়ে তিন সেই পাঁচ সাড়ে তিনই রয়ে গেলাম। বুঝলুম, টাগ অফ ওয়ারের দড়ির বদলে আমাকে ধরে টানলেও লম্বা আমি হব না। শেষটায় ভাবলুম—দুত্তোরি, গায়ের মাস্‌লের কথা আর ভাববো না, তার চেয়ে ব্রেনের মাস্‌লের দিকে অ্যাটেনশন দেওয়া যাক। আর মেনটাল হাইট। শুরু করলাম রোমাঞ্চ উপন্যাস লেখা। লালমোহন গাংগুলী নাম তো আর চলে না, তাই নিলুম ছদ্মনাম—জটায়ু। ফাইটার। কী ফাইটটা দিয়েছিল রাবণকে বলুন তো !'

ট্রেনটাকে ফাস্ট প্যাসেঞ্জার বললেও কাছাকাছির মধ্যে এত স্টেশন পড়ছে যে পনেরো-কুড়ি মিনিটের বেশি একটানা গাড়ি চলতেই পারছে না। ফেলুদা প্যারাসাইকলজিক্যাল পত্রিকা ছেড়ে এখন রাজস্থানের বিষয়ে একটা বই পড়তে শুরু করেছে। রাজস্থানের কেল্লার সব ছবি রয়েছে এ বইতে। সেগুলো সে খুব খুঁটিয়ে দেখছে আর মন দিয়ে তাদের বর্ণনা পড়ছে। আমাদের সামনে আপার বার্থে আরেকজন ভদ্রলোক রয়েছেন, তাঁর গোঁফ আর পোশাক দেখলেই বোঝা যায় তিনি বাঙালী নন। ভদ্রলোক একটার পর একটা কমলালেবু খেয়ে চলেছেন, আর





তার খোসা আর ছিবড়ে ফেলছেন সামনে পাতা একটা উর্দু খবরের কাগজের উপর।

ফেলুদা পকেট থেকে একটা নীল পেনসিল বার করে হাতের বইটাতে দাগ দিচ্ছিল, এমন সময় লালমোহনবাবু বললেন, 'কিছু মনে করবেন না—আপনি কি মশাই গোয়েন্দা জাতীয় কিছু ?'

'কেন বলুন তো ?'

'না, মানে, যেভাবে ফস করে তখন আমার ব্যাপারটা বলে দিলেন...'

'আমার ও ব্যাপারে ইন্টারেস্ট আছে।'

'বাঃ ! তা আপনারাও তো যোধপুরেই যাচ্ছেন বলে বললেন।'

'আপাতত।'

'কোনো রহস্য আছে নাকি ? যদি থাকে তো আমি কিন্তু আপনাদের সঙ্গে ঝুলে পড়ব—ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড। এমন সুযোগ আর আসবে না।'

'আপনার উটের পিঠে চড়তে আপত্তি নেই তো ?'

'আরেব্বাস, উট ! ভদ্রলোক চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল। 'শিপ অফ দি ডেজার্ট ! এ তো আমার স্বপ্ন মশাই। আমার আরক্ত আরব উপন্যাসে আমি বেদুইনের কথা লিখেছি যে ! তাছাড়া সাহারায় শিহরনেও আছে। অদ্ভুত জীব। নিজের ওয়াটার সাপ্লাই নিজের পাকস্থলীর মধ্যে নিয়ে বালির সমুদ্র দিয়ে সার বেঁধে চলেছে। কী রোমান্টিক—ওঃ !'

ফেলুদা বলল, 'পাকস্থলীর ব্যাপারটা কি আপনার বইয়ে লিখেছেন নাকি ?

লালমোহনবাবু থতমত খেয়ে বললেন, 'ওটা ঠিক নয় বুঝি ?'

ফেলুদা মাথা নেড়ে বলল, 'জল আসে উটের কুঁজ থেকে। কুঁজটা আসলে চর্বি। ওই চর্বিকে অক্সিডাইজ করে উট জল করে নেয়। এক নাগাড়ে দশপনেরো দিন ওই চর্বির জোরে জল না খেয়ে থাকতে পারে। অবিশ্যি একবার জলের সন্ধান পেলে দশ মিনিটে পঁচিশ গ্যালনও খেয়ে নেয় বলে শোনা গেছে।'

লালমোহনবাবু বললেন, 'ভাগ্যিস বললেন। নেক্সট এডিশনে ওটা কারেক্ট করে দেবো।'

॥ ৪ ॥

এখানকার ট্রেন ঢিমে হলেও, বেশি যে লেট করছে না এটাই ভাগ্যি। গাড়ি বদল করার ব্যাপার যেখানে থাকে, সেখানে লেট করলে অনেক সময় ভারী মুশকিল হয়।

ভরতপুর স্টেশনে এসে আমরা প্রথম ময়ূর দেখলাম। প্ল্যাটফর্মের উল্টোদিকে তিনটে ময়ূর দিব্যি লাইনের উপর ঘুরে বেড়াচ্ছে। ফেলুদা বলল, 'কলকাতায়

যেমন কাক-চড়ুই দেখিস সর্বত্র, এখানে তেমনি দেখবি ময়ূর আর টিয়া।'

লোকজন যা দেখা যাচ্ছে, তাদের মধ্যে পাগড়ি আর গালপাট্টার সাইজ ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এরা সবাই রাজস্থানী। এদের পরনে খাটো ধুতি হাঁটু অবধি তোলা, আর একপাশে বোতামওয়ালা জামা। এ ছাড়া পায়ে আছে ভারী নাগরা, আর অনেকের হাতেই একটা করে লাঠি।

বান্দিকুই স্টেশনের রিফ্রেশমেন্ট রুমে বসে রুটি আর মাংসের ঝোল খেতে-খেতে লালমোহনবাবু বললেন, 'এই যে সব লোক দেখছেন, এদের মধ্যে এক-আধটা ডাকাত থাকার সম্ভাবনা কিন্তু খুব বেশি। আরাবল্লী পাহাড় হল গিয়ে ডাকাতদের আস্তানা, জানেন তো ? আর এ সব ডাকাত কীরকম পাওয়ারফুল হয় সেটা নিশ্চয়ই আপনাকে বলে দিতে হবে না। জানালার লোহার শিক দু-হাতে দু-দিকে টেনে ফাঁক করে জেলখানা থেকে পালায় মশাই এরা।'

ফেলুদা বলল, 'জানি। আর কারুর উপর ক্ষেপে গেলে এরা কীভাবে শাস্তি দেয় বলুন তো ?'

'মেরে ফেলে নিশ্চয়ই ?'

'উঁহু। ওইখানেই তো মজা। সে লোক যেখানেই থাকুক না কেন, তাকে খুঁজে বের করে তলোয়ার দিয়ে নাকটা কেটে ছেড়ে দেয়।'

লালমোহনবাবুর হাতের মাংসের টুকরোটা আর মুখে পোরা হল না।

'নাক কেটে ?'

'তাই তো শুনেছি।'

'এ যে সেই পৌরাণিক যুগের সাজার মতো মনে হচ্ছে মশাই। কী সাংঘাতিক !'

মাঝরাত্তিরে মারওয়াড়ের ট্রেনে ওঠার সময় অন্ধকারে একটু হ্যাঁচোড় প্যাঁচোড় করতে হলেও, জায়গা পেতে অসুবিধা হল না। রাত্রে ঘুমও হল ভালো। সকালে ঘুম থেকে উঠে চলন্ত ট্রেনের জানালা দিয়ে একটা পাহাড়ের মাথায় একটা পুরানো কেল্লা দেখতে পেলাম। তার এক মিনিটের মধ্যেই গাড়ি কিষণগড় স্টেশনে এসে থামল। ফেলুদা বলল, 'জায়গার নামে গড় আছে দেখলেই বুঝবি কাছাকাছির মধ্যে কোথাও এরকম একটা পাহাড়ের উপর একটা কেল্লা আছে।'

কিষণগড় স্টেশনে প্ল্যাটফর্মে নেমে চা খেলাম। এখানকার চায়ের ভাঁড়গুলো দেখলাম বাংলাদেশের ভাঁড়ের চেয়ে অনেক বেশি বড় আর মজবুত। চায়ের স্বাদও একটু অন্য রকম। ফেলুদা বলল যে, উটের দুধ দিয়ে তৈরি। সেটা শুনেই বোধহয় লালমোহনবাবু পর পর দু'ভাঁড় চা খেলেন।

চা খেয়ে প্ল্যাটফর্মের কলে চট করে দাঁতটা মেজে চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে গাড়িতে ফিরে এসে দেখি, বিরাট পাগড়ি মাথায় একটা রাজস্থানী লোক নাক





অবধি চাদর ঢেকে বেঞ্চির উপর পা তুলে হাঁটুর উপর থুতনি ভর করে লালমোহনবাবুর বেঞ্চির একটা পাশ দখল করে বসে আছে। চাদরের ফাঁক দিয়ে ভেতরের জামার রংটা দেখলাম টকটকে লাল।

লালমোহনবাবু কামরায় ঢুকে তাকে দেখেই সটান নিজের জায়গা ছেড়ে আমাদের বেঞ্চির একটা কোণে বসে পড়লেন। ফেলুদা 'তোরা আরাম করে বোস' বলে একেবারে সেই রাজস্থানীটার পাশেই বসে পড়ল।

আমি লোকটার পাগড়িটা লক্ষ করছিলাম। কত অজস্র প্যাঁচ আছে ওই পাগড়িতে সেটা ভেবে কুলকিনারা পাচ্ছিলাম না। লালমোহনবাবু চাপা গলায়

ফেলুদাকে উদ্দেশ করে বলল, 'পাওয়ারফুলি সাস্‌পিশাস্‌। এরকম চাষাভুষোর মতো পোশাক অথচ দিব্যি প্রথম শ্রেণীতে উঠে বসে আছে। কত হীরেজহরত আছে ওই পুঁটলিটার মধ্যে কে জানে !'

পুঁটলিটা পাশেই রাখা ছিল। ফেলুদা খালি একটু হাসল, মুখে কিছু বলল না।

গাড়ি ছেড়ে দিল। ফেলুদা তার ঝোলার ভিতর থেকে রাজস্থানের বইটা বার করে নিল। আমি নিউম্যানের ব্র্যাড্‌শ টাইম-টেবলটা খুলে সামনে কী কী স্টেশন পড়বে দেখতে লাগলাম। অদ্ভুত নাম এখানকার সব স্টেশনের—গালোটা, তিলাওনিয়া, মাক্রেরা, ভেসানা, সেন্দ্রা। কোত্থেকে এল এসব নাম কে জানে। ফেলুদা বলে জায়গার নামের মধ্যে নাকি অনেক ইতিহাস লুকোনো থাকে। কিন্তু সে সব ইতিহাস খুঁজে বার করবে কে ?

গাড়ি ঘটর ঘটর করে চলেছে, আমি রাজকাহিনীর শিলাদিত্য বাপ্পাদিত্যের কথা

ভাবছি, এমন সময় বুঝতে পারলাম আমার সার্টের পাশটায় একটা টান পড়ছে। পাশ ফিরে দেখি লালমোহনবাবুর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। চোখাচোখি হতেই তিনি ঢোক গিলে শুকনো গলায় ফিস ফিস করে বললেন, 'ব্লাড।'

ব্লাড ? লোকটা বলে কী ?

তারপর তার দৃষ্টি ঘুরে গেল সামনের রাজস্থানী লোকটার দিকে। লোকটা মাথা পিছন দিকে হেলিয়ে মুখ হাঁ করে ঘুমিয়ে আছে। এবার তার বেঞ্চির উপরে তোলা পা দুটোর দিকে চোখ গেল। দেখলাম, বুড়ো আঙুলের পাশটা ছাল উঠে রক্ত জমে রয়েছে। তারপর বুঝলাম এতক্ষণ কাপড়ে যেগুলোকে মাটির দাগ বলে মনে হচ্ছিল, সেগুলো আসলে শুকনো লালচে রক্ত।

ফেলুদার দিকে চেয়ে দেখি, ও দিব্যি একমনে বই পড়ে চলেছে।

লালমোহনবাবুর পক্ষে বোধ হয় ফেলুদার নিশ্চিন্ত ভাবটা সহ্য হল না। তিনি হঠাৎ সেই শুকনো গলাতেই বলে উঠলেন, মিস্টার মিটার, সাস্‌পিশাস্ ব্লাড-মার্কস্ অন আওয়ার নিউ কো-প্যাসেঞ্জার।'

ফেলুদা বই থেকে চোখ তুলে একবার ঘুমন্ত লোকটার দিকে দেখে নিয়ে বলল, 'প্রব্যাব্‌লি কজ্‌ড বাই বাগ্‌স।'

রক্তের কারণ ছারপোকা হতে পারে জেনে জটায়ু কেমন জানি মুষড়ে পড়লেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর ভয় যে কাটল না সেটা তাঁর জড়োসড়ো ভাব আর বার বার ভুরু কুঁচকে আড়চোখে ঘুমন্ত লোকটার দিকে চাওয়া থেকে বুঝতে পারছিলাম।

দুপুর আড়াইটার সময় গাড়ি মারওয়াড় জংশনে পৌঁছাল। খাওয়াটা স্টেশনের রিফ্রেশমেন্ট রুমে সেরে ঘণ্টাখানেক প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করে সাড়ে তিনটেয় যোধপুরের গাড়িতে ওঠার সময় আর সেই লাল জামা পরা লোকটাকে দেখতে পেলাম না।

আড়াই ঘণ্টার জার্নির মধ্যে ঘন ঘন উটের দল চোখে পড়ায় লালমোহনবাবু বার বার উত্তেজিত হয়ে পড়ছিলেন। যোধপুরে পৌঁছলাম ছ'টা বেজে দশ মিনিটে। ট্রেনটি কুড়ি মিনিট লেট করেছে। কলকাতা হলে এতক্ষণে সূর্য ডুবে যেত, কিন্তু এদিকটা পশ্চিমে বলে এখনো দিব্যি রোদ রয়েছে।

আমাদের বুকিং ছিল সার্কিট হাউসে। লালমোহনবাবু বললেন তিনি নিউ বম্বে লজে থাকছেন। 'কাল সকাল সকাল এসে পড়ব, একসঙ্গে ফোর্টে যাওয়া যাবে' বলে ভদ্রলোক টাঙ্গার লাইনের দিকে এগিয়ে গেলেন।

আমরা একটা ট্যাক্সি নিয়ে স্টেশন থেকে বেরিয়ে পড়লাম। শুনলাম সার্কিট হাউসটা খুব কাছেই। যেতে যেতে বাড়ির ফাঁক দিয়ে ফাঁক দিয়ে লক্ষ করছিলাম একটা বিরাট পাথরের পাঁচিল—প্রায় একটা দোতলা বাড়ির সমান উঁচু ! ফেলুদা





বলল, এককালে পুরো যোধপুর শহরটাই নাকি ওই পাঁচিলটা দিয়ে ঘেরা ছিল। ওটার সাত জায়গায় নাকি সাতটা ফটক আছে। বাইরে থেকে সৈন্য আক্রমণ করতে আসছে জানলে ওই ফটকগুলো বন্ধ করে দেওয়া হত।

আরেকটা রাস্তার মোড় ঘুরতেই ফেলুদা বলল, 'ওই দ্যাখ্ বাঁ দিকে।'

চেয়ে দেখি শহরের বাড়ির মাথার উপর দিয়ে দূরে দেখা যাচ্ছে বিরাট থম্‌থমে এক কেল্লা। বুঝলাম ওটাই হল বিখ্যাত যোধপুর ফোর্ট। আমি জানতাম এখানকার রাজারা মোগলদের হয়ে লড়াই করেছে।

কখন কেল্লাটা কাছ থেকে দেখতে পাবো সেটা ভাবতে ভাবতেই সার্কিট হাউসে পৌঁছে গেলাম। গেটের ভিতর দিয়ে ঢুকে একটা বাগানের পাশ দিয়ে গিয়ে একটা পোর্টিকোর তলায় আমাদের ট্যাক্সি দাঁড়াল। মালপত্তর নামিয়ে ট্যাক্সির ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে আমরা ভিতরে ঢুকলাম। একজন ভদ্রলোক এগিয়ে এসে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলেন আমরা কলকাতা থেকে আসছি কিনা আর ফেলুদার নাম মিস্টার মিটার কিনা। ফেলুদা 'হ্যাঁ' বলাতে ভদ্রলোক বললেন—আপনাদের জন্য একতলায় একটা ডাবল রুম বুক করা আছে। খাতায় নাম সই করার সময় আমাদের নামের কয়েক লাইন উপরেই পর পর দুটো নাম চোখে পড়ল—ডক্টর এইচ এম হাজরা আর মাস্টার এম ধর।

সার্কিট হাউসের প্ল্যানটা খুব সহজ। ঢুকেই একটা বড় খোলা জায়গা, বাঁ দিকে রিসেপশন কাউন্টার আর ম্যানেজারের ঘর, সামনে দোতলার সিঁড়ি, ডাইনে আর বাঁয়ে দু-দিকে লম্বা বারান্দার পাশে পর পর লাইন করে ঘর। বারান্দায় বেতের চেয়ার পাতা রয়েছে। একজন বেয়ারা এসে আমাদের মাল তুলে নিল, আমরা তার পিছন পিছন ডান দিকের বারান্দা দিয়ে রওনা দিলাম তিন নম্বর ঘরের দিকে। একজন সরু গোঁফওয়ালা মাঝবয়সী ভদ্রলোক একটা বেতের চেয়ারে বসে একজন মারওয়াড়ি টুপি পরা ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছিলেন ; আমরা তার পাশ দিয়ে যাবার সময় পরিষ্কার বাংলায় বললেন, 'বাঙালী মনে হচ্ছে ?' ফেলুদা হেসে 'হ্যাঁ' বলল। আমরা তিন নম্বর ঘরে গিয়ে ঢুকলাম।

বেশ বড় ঘর। দুটো পাশাপাশি খাট, তাতে আবার মশারির ব্যবস্থা রয়েছে। একপাশে একটা দু'জন-বসার আর দুটো একজন বসার সোফা, আর একটা গোল টেবিলের উপর একটা অ্যাশ-ট্রে। এ ছাড়া ড্রেসিং টেবিল, আলমারি আর খাটের পাশে দুটো ছোট টেবিলে জলের ফ্লাস্ক, গেলাস আর বেড-সাইড ল্যাম্প। ঘরের সঙ্গে লাগা বাথরুমের দরজাটা বাঁ দিকে।

ফেলুদা বেয়ারাকে চা আনতে বলে পাখাটা খুলে দিয়ে সোফায় বসে বলল, 'খাতায় নাম দুটো দেখলি ?'

আমি বললাম, হ্যাঁ। কিন্তু ওই চাড়া-দেওয়া গোঁফওয়ালা লোকটা আশা করি

ডক্টর হাজরা নন।'

'কেন ? হলে ক্ষতি কী ?'

ক্ষতি যে কী সেটা অবিশ্যি আমি চট কর ভেবে বলতে পারলাম না। ফেলুদা আমার ইতস্তত ভাব দেখে বলল, 'তোর আসলে লোকটাকে দেখে ভালো লাগেনি। তুই মনে মনে চাইছিস যে ডক্টর হাজরা লোকটা খুব শান্তশিষ্ট হাসিখুশি অমায়িক হন—এই তো ?'

ফেলুদা ঠিকই ধরেছে। এ লোকটাকে দেখলে বেশ সেয়ানা বলেই মনে হয়। তা ছাড়া বোধহয় বেশ লম্বা আর জাঁদরেল। ডাক্তার বলতে যা বোঝায় তা মোটেই নয়।

ফেলুদা একটা সিগারেট শেষ করতে না করতেই চা এসে গেল, আর বেয়ারা ঘর থেকে বেরোতে না বেরোতেই দরজায় টোকা পড়ল। ফেলুদা ভীষণ বিলিতি কায়দায় বলে উঠল, 'কাম ইন !' পর্দা ফাঁক করে ভেতরে ঢুকলেন মিলিটারি গোঁফ।

'ডিসটার্ব করছি না তো ?'

'মোটেই না। বসুন। চা খাবেন ?'

'নাঃ। এই অল্পক্ষণ আগেই খেয়েছি। আর ফ্র্যাঙ্কলি স্পীকিং—চা-টা এখানে তেমন সুবিধের নয়। শুধু এখানে বলছি কেন, ভারতবর্ষ হল খাস চায়ের দেশ, অথচ ক'টা হোটেলে ক'টা ডাকবাংলোয় ক'টা সার্কিট হাউসে ভালো চা খেয়েছেন আপনি বলুন তো ? অথচ বাইরে যান, বিদেশে যান—অ্যালবেনিয়ার মতো জায়গায় গিয়ে ভালো চা খেয়েছি জানেন ? ফার্স্ট ক্লাস দার্জিলিং টি। আর ইউরোপের অন্য বড় শহরে তো কথাই নেই। একমাত্র খারাপ যেটা লাগে সেটা হল কাপড়ের থলিতে চায়ের পাতার ব্যাপারটা—যাকে টি-ব্যাগস বলে। কাপে থাকবে গরম জল, আর একটা সুতো বাঁধা কাপড়ের থলিতে থাকবে চায়ের পাতা। সেইটে জলে ডুবিয়ে লিকার তৈরি করে নিতে হবে আপনাকে। তারপর তাতে আপনি দুধ দিন কী লেবু কচলে দিন সেটা আপনার রুচি। লেমন টি-টাই আমি বেশি প্রেফার করি। তবে তার জন্যে চাই ভালো লিকার। এখানকার চা খুব অর্ডিনারি।'

'আপনার তো অনেক দেশ-টেশ ঘোরা আছে বুঝি ?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

'ওইটেই তো করেছি সারা জীবন ধরে', ভদ্রলোক বললেন। 'আমি হলাম যাকে বলে গ্লোব-ট্রটার। তার সঙ্গে আবার শিকারের শখও আছে। সেটা অবিশ্যি আফ্রিকায় থাকতেই হয়েছিল। আমার নাম মন্দার বোস।'

গ্লোব-ট্রটার উমেশ ভট্‌চার্যের নাম শুনেছি, কিন্তু এঁর নাম তো শুনিনি। ভদ্রলোক যেন আমার মনের কথাটা আন্দাজ করেই বললেন, 'অবিশ্যি আমার নাম





আপনাদের শোনার কথা নয়। যখন প্রথম বেরিয়েছিলাম, তখন কাগজে নামটাম বেরিয়েছিল। তারপর এই ছত্রিশ বছর পরে মাস তিনেক হল সবে দেশে ফিরেছি।'

'সে অনুপাতে আপনার বাংলার উপর দখলটা তো ভালো আছে বলতে হবে।'

'দেখুন মশাই, সেটা এন্‌টায়ারলি আপনার ইচ্ছে অনিচ্ছের ওপর নির্ভর করে। আপনি যদি বিদেশে বাংলা ভুলবেন বলে ইচ্ছে করেন, তা হলে তিন মাসে ভুলে যেতে পারেন। আর তা যদি ইচ্ছে না করেন, তা হলে ত্রিশ বছরেও ভোলবার কোনো চান্স নেই। অবিশ্যি আমি আবার বাঙালীর সঙ্গও পেয়েছি যথেষ্ট। কিনিয়াতে একবার হাতির দাঁতের ব্যবসা শুরু করেছিলাম, তখন আমার সঙ্গে একটি বাঙালী ছিলেন। আমরা এক সঙ্গে ছিলাম প্রায় সাত বচ্ছর।'

'সার্কিট হাউসে আপনি ছাড়া আর কেউ বাঙালী আছেন কি ?'

এটা অনেকবার লক্ষ করেছি, বাজে কথায় সময় নষ্ট করার লোক ফেলুদা নয়!

ভদ্রলোক বললেন, 'আছে বইকি। সেটাই তো আশ্চর্য লাগছে আমার। আসলে কলকাতায় বাঙালীদের আর সোয়াস্তি নেই সেটা বেশ বুঝতে পারছি। তাই সুযোগ পেলেই এদিকে ওদিকে গিয়ে ঘুরে আসছে। অবিশ্যি দিস ম্যান হ্যাজ কাম উইথ এ পারপাস্। ভদ্রলোক সাইকলজিস্ট। তবে গোলমেলে ব্যাপার বলে মনে হয়। সঙ্গে একটি ছেলে আছে বছর আষ্টেকের, সে নাকি জাতিস্মর। পূর্বজন্মে রাজস্থানে কোনো কেল্লার কাছে নাকি জন্মেছিল। ভদ্রলোক ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে সেই কেল্লা খুঁজে বেড়াচ্ছেন। ডাক্তারটি বুজরুক না ছেলেটি ধাপ্পা দিচ্ছে বোঝা শক্ত। এমনিতেও ছেলেটির হাবভাব সাস্‌পিশাস্। কারুর সঙ্গে ভালো করে কথা বলে না। কিছু জিজ্ঞেস করলে জবাব দেয় না। ভেরি ফিশি। অনেক তো দেখলুম ভণ্ডামি এই ত্রিশ বছরে, আবার এখানে এসেও যে সেই একই জিনিস দেখতে হবে তা ভাবিনি।'

'আপনি কি এখানেও ট্রটিং করতে এসেছেন নাকি ?'

ভদ্রলোক হেসে সোফা ছেড়ে উঠে পড়ে বললেন, 'টু টেল ইউ দ্য ট্রুথ—নিজের দেশটা ভালো করে দেখাই হয়নি এখনো। বাই দ্য ওয়ে—আপনার পরিচয়টা তো পাওয়া গেল না !'

ফেলুদা নিজের আর আমার পরিচয় দিয়ে বলল, 'আমি আবার আমার দেশের বাইরে কোথাওই যাইনি।'

'আই সী। ওয়েল—সাড়ে আটটা নাগাদ যদি ডাইনিং রুমে আসেন তো আবার দেখা হবে। আমার আবার আর্লি টু বেড, আর্লি টু রাইজ...'

ভদ্রলোকের সঙ্গে আমরাও দু'জনে বাইরের বারান্দায় এলাম। এসে দেখলাম, গেট দিয়ে একটা ট্যাক্সি ঢুকছে। সেটা এসে সার্কিট হাউসের সামনে থামল, আর

সেটা থেকে নামল একটি বছর চল্লিশের মাঝারি হাইটের ভদ্রলোক আর একটা রোগা ফরসা বাচ্চা ছেলে। বোঝাই গেল যে এরাই হচ্ছে ডক্টর হেমাঙ্গ হাজরা এবং জাতিস্মর শ্রীমান মুকুল ধর।

॥ ৫ ॥

মিস্টার বোস ডক্টর হাজরাকে গুড ইভনিং বলে নিজের ঘরের দিকে চলে গেলেন। ডক্টর হাজরা ছেলেটির হাত ধরে বারান্দা দিয়ে আমাদের দিকেই এগিয়ে এসে, বোধহয় হঠাৎ দু'জন অচেনা বাঙালীকে দেখে কেমন যেন একটু থতমত খেয়ে গেলেন। ফেলুদা হেসে নমস্কার করে বলল, 'আপনিই বোধ হয় ডক্টর হাজরা ?'

'হ্যাঁ—কিন্তু আপনাকে তো— ?'

ফেলুদা পকেট থেকে তার একটা কার্ড বার করে ডক্টর হাজরাকে দিয়ে বলল, 'আপনার সঙ্গে একটু কথা ছিল। সত্যি বলতে কী, আমরা আপনার খোঁজেই এসেছি। সুধীরবাবুর অনুরোধে। সুধীরবাবু একটা চিঠিও দিয়ে দিয়েছেন আপনার নামে।'

'ও। আই সী। মুকুল, তুমি ঘরে যাও, আমি এঁদের সঙ্গে একটু কথা বলে আসছি, কেমন ?'

'আমি বাগানে যাব।'

ছেলেটির গলা বাঁশির মতো মিষ্টি, যদিও কথাটা বলল, একেবারে নেড়াভাবে, এক সুরে। প্রায় যেন একটা যন্ত্রের মানুষের ভেতর থেকে কথা বেরোচ্ছে। ডক্টর হাজরা বললেন, 'ঠিক আছে, বাগানে যাও, তবে লক্ষ্মী হয়ে থেকো, গেটের বাইরে যেও না, কেমন ?'

ছেলেটি আর কিছু না বলে বারান্দা থেকে এক লাফে নুড়িফেলা জায়গাটায় নামল। তারপর একটা ফুলের লাইন টপকে বাগানের ঘাসের উপর পৌঁছে চুপ করে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল। ডক্টর হাজরা আমাদের দিকে ফিরে কেমন যেন একটু অপ্রস্তুত হাসি হেসে বললেন, 'কোথায় বসবেন ?'

'আসুন আমাদের ঘরে।'

ডক্টর হাজরার কানের চুলে পাক ধরেছে। চোখ দুটোয় বেশ একটা তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ছাপ আছে। কাছ থেকে দেখে মনে হল বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকছি। আমরা তিনজনে সোফায় বসলাম। ফেলুদা ডক্টর হাজরাকে সুধীরবাবুর চিঠিটা দিয়ে তাঁকে একটা চারমিনার অফার করল। ভদ্রলোক একটু হেসে 'ও রসে বঞ্চিত' বলে চিঠিটা পড়তে লাগলেন।





পড়া হলে পর ডক্টর হাজরা চিঠিটা ভাঁজ করে খামে পুরে রাখলেন।

ফেলুদা এবার নীলুকে কিডন্যাপ করার ঘটনা বলে বলল, 'সুধীরবাবু ভয় পাচ্ছিলেন যে ওই লোকগুলো হয়ত মুকুলকে ধাওয়া করে একেবারে যোধপুর পর্যন্ত চলে এসেছে। সেই কারণেই উনি বিশেষ চিন্তিত হয়ে আমার কাছে এসেছিলেন। আমি খানিকটা তাঁর অনুরোধে পড়েই এসেছি। অবিশ্যি দুর্ঘটনা যদি কোনো না ঘটে তাহলেও আমাদের আসাটা যে একেবারে ব্যর্থ হবে তা নয়, কারণ রাজস্থান দেখার শখটা অনেক দিনের।'

ডক্টর হাজরা একটুক্ষণ ভেবে বললেন, 'দুশ্চিন্তার কারণ যাকে বলে সে রকম অবিশ্যি এখনো পর্যন্ত কিছু ঘটেনি। তবে ব্যাপারটা কী জানেন, খবরের কাগজের রিপোর্টারদের অতগুলো কথা না বললেও চলত। আমি সুধীরবাবুকে বলেছিলাম যে ইনভেস্টিগেশনটা সেরে নিই, তারপর আপনি যত ইচ্ছা রিপোর্টার ডাকতে চান ডাকতে পারেন। বিশেষ করে যেখানে গুপ্তধনের কথাটা বলছে। আমি না হয় জানি যে কোনো কথাটারই হয়ত ভিত্তি নেই, কিন্তু কিছু লোক থাকে যারা সহজেই প্রলুব্ধ হয়ে পড়ে।'

'জাতিস্মর ব্যাপারটা সম্বন্ধে আপনি কী মনে করেন ?'

'মনে যা করি সেটাকে তো এখনো পর্যন্ত অন্ধকারে ঢিল মারা ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না। অথচ ঢিল না মেরেই বা কী করি বলুন। জাতিস্মর যে আগেও এক-আধটা বেরোয়নি তা তো নয়। আর তাদের অনেক কথাই তো হুবহু মিলে গেছে। সেই জন্যেই যখন এই মুকুল ছেলেটির খবর পাই, তখনই ঠিক করি যে একে নিয়ে একটা থরো ইনভেস্টিগেশন করব। যদি দেখি যে এর কথার সঙ্গে সব ডিটেল মিলে যাচ্ছে, তখন সেটাকে একটা প্রামাণ্য ঘটনা হিসেবে ধরে তার উপর গবেষণা চালাব।'

'কিছুদূর এগিয়েছেন কি ?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

'এইটে অন্তত বুঝেছি যে, রাজস্থান সম্বন্ধে কোনো ভুল করিনি। এখানকার মাটিতে পা দেওয়ার পর থেকে মুকুলের হাবভাব বদলে গেছে। বুঝতেই তো পারছেন, বাপ-মা-ভাই-বোনকে এই প্রথম ছেড়ে একজন অচেনা লোকের সঙ্গে চলে এল, অথচ এই ক'দিনে একটিবার তাদের নাম পর্যন্ত করল না।'

'আপনার সঙ্গে সম্পর্ক কেমন ?'

'কোনো গোলমাল নেই। কারণ, বুঝতেই তো পারছেন, আমি ওকে ওর স্বপ্নরাজ্যে নিয়ে চলেছি। ওর সমস্ত মনটাই তো পড়ে আছে ওর সোনার কেল্লার দেশে, আর এখানে এসে কেল্লা দেখলেই ও লাফিয়ে উঠছে।'

'কিন্তু সোনার কেল্লা দেখেছে কি ?'

ডক্টর হাজরা মাথা নাড়লেন।

'না। তা দেখেনি। আসবার পথে কিষণগড় দেখিয়ে এনেছি। গতকাল সন্ধ্যায় এখানকার ফোর্টটা দেখেছে বাইরে থেকে। আজ বারমের নিয়ে গিয়েছিলাম। প্রতিবারই বলে—এটা নয়—আরেকটা দেখবে চলো। এ ব্যাপারে ধৈর্য লাগে মশাই। অথচ চিতোর উদয়পুরের দিকটা গিয়ে কোনো লাভ নেই, কারণ ওদিকে বালি নেই। বালির কথা ও বার বার বলে, আর বালি বলতে এদিকটাতেই আছে, আর আগেও তাই ছিল। কাল তাই ভাবছি বিকানিরটা দেখিয়ে আনব।'

'আমরা আপনার সঙ্গে গেলে আপত্তি নেই তো?'

'মোটেই না। আর শুধু তাই না। আপনি সঙ্গে থাকলে কিছুটা নিশ্চিন্ত হতে পারব, কারণ...একটা ঘটনা...'

ভদ্রলোক চুপ করলেন। ফেলুদা সিগারেটের প্যাকেটটা পকেট থেকে বার করেছিল, কিন্তু সেটা আর খুলল না।

'কাল সন্ধ্যায় একটা টেলিফোন এসেছিল,' ডক্টর হাজরা বললেন।

'কোথায়?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

'এই সার্কিট হাউসে। আমি তখন কেল্লা দেখতে গেছি। কেউ একজন ফোন করে জানতে চেয়েছিল, কলকাতা থেকে একজন ভদ্রলোক একটি ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে কিনা। ম্যানেজার ন্যাচারেলি হ্যাঁ বলে দিয়েছে।'

ফেলুদা বলল, 'কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে কলকাতার কাগজের খবরটা এখানে কেউ কেউ হয়ত জানে, এবং সেই জন্যেই সেটাকে ভেরিফাই করার জন্যে এখানে ফোন করেছে। যোধপুরে তো বাঙালীর অভাব নেই। এসব ব্যাপারে কৌতূহল জিনিসটা স্বাভাবিক নয় কি?'

'বুঝলাম। কিন্তু সে লোক আমি এসেছি জেনেও আর খোঁজ করল না কেন? বা এখানে এল না কেন?'

'হুঁ...'ফেলুদা গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ল। 'আমার মনে হয় আমি আপনার সঙ্গে থাকাটাই ভালো। আর মুকুলকেও একা ছাড়বেন না বেশি।'

'পাগল!'

ডক্টর হাজরা উঠে পড়লেন।

'কালকের জন্যে একটা ট্যাক্সির বন্দোবস্ত করা আছে। আপনারা তো মাত্র দু'জন, তাই একটা ট্যাক্সিতেই হয়ে যাবে।'

ভদ্রলোক যখন দরজার দিকে এগোচ্ছেন তখন ফেলুদা হঠাৎ একটা প্রশ্ন করে বসল—

'ভালো কথা—শিকাগোতে আপনাকে জড়িয়ে একবার কোনো ঘটনা ঘটেছিল কি? এই বছর চারেক আগে?'

ডক্টর হাজরা ভুরু কুঁচকোলেন।





'ঘটনা? শিকাগোতে আমি গেছি বটে...'

'একটা আধ্যাত্মিক চিকিৎসালয় সংক্রান্ত ব্যাপার...?'

ডক্টর হাজরা হো হো করে হেসে উঠলেন—'ওহো—সেই স্বামী ভবানন্দের ব্যাপার? যাকে আমেরিকানরা বলত ব্যাব্যানান্ডা! ঘটেছিল বটে, কিন্তু কাগজে যেটা বেরিয়েছিল সেটা অতিরঞ্জিত। লোকটা ভণ্ড ঠিকই, কিন্তু সে রকম ভণ্ড অনেক হাতুড়ে, অনেক টোটকাওয়ালাদের মধ্যে পাওয়া যায়। তার চেয়ে বেশি কিছু না। ওর বুজরুকি আসলে ধরে ফেলে ওর পেশেন্টরাই। খবরটা রটে যায়। প্রেস থেকে আমার কাছে আসে ওপিনিয়নের জন্য। আমি বরং ওর সম্বন্ধে খানিকটা মোলায়েম করেই বলেছিলাম। কাগজে তিলটাকে তাল করে ছাপায়। তারপর আমার ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয়ও হয়েছিল। আমি নিজেই ওর সঙ্গে দেখা করে ব্যাপারটা ক্লিয়ার করে নিই—অ্যান্ড উই পার্টেড অ্যাজ ফ্রেন্ড্স।'

'ধন্যবাদ। কাগজের রিপোর্ট দেখে আমার ধারণা অন্যরকম হয়েছিল।'

ডক্টর হাজরার সঙ্গে সঙ্গে আমরাও ঘর থেকে বেরোলোম। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। পশ্চিমের আকাশটা এখনো লাল, তবে রাস্তার বাতি জ্বলে গেছে। কিন্তু মুকুল কোথায়? বাগানে ছিল সে, কিন্তু এখন দেখছি নেই। ডক্টর হাজরা চট করে একবার নিজের ঘরে খুঁজে ব্যস্তভাবে বেরিয়ে এলেন।

'ছেলেটা গেল কোথায়' বলে ভদ্রলোক বারান্দা থেকে বাইরে নামলেন। আমরা তার পিছন পিছন গেলাম বাগানে। বাগানে যে নেই সে ছেলে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

'মুকুল!' ডক্টর হাজরা ডাক দিলেন। 'মুকুল!'

'ও আপনার ডাক শুনেছে,' ফেলুদা বলল। 'ও আসছে।'

আবছা অন্ধকারে দেখলাম মুকুল রাস্তা থেকে গেট দিয়ে ঢুকল। আর সেই সঙ্গে দেখলাম উল্টো দিকের ফুটপাথ দিয়ে একটা লোক দ্রুত হেঁটে পুবদিকে নতুন প্যালেসের দিকটায় চলে গেল। লোকটার মুখ দেখতে পারলাম না বটে, কিন্তু তার গায়ের জামার টকটকে লাল রংটা এই অন্ধকারেও স্পষ্ট বুঝতে পারলাম। ফেলুদা দেখেছে কি লোকটাকে?

মুকুল এগিয়ে এল আমাদের দিকে। ডক্টর হাজরা হাসিমুখে হাত বাড়িয়ে এগিয়ে গেলেন। তারপর খুব নরম গলায় বললেন—

'ওরকমভাবে বাইরে বেরোতে হয় না মুকুল!'

'কেন?' মুকুল ঠাণ্ডা গলায় জিজ্ঞেস করল।

'অচেনা জায়গা—কতরকম দুষ্ট লোক আছে এখানে।'

'আমি তো চিনি।'

'কাকে চেনো?'

মুকুল হাত বাড়িয়ে রাস্তার দিকে দেখাল—

'ওই যে, যে লোকটা এসেছিল।'

হেমাঙ্গবাবু মুকুলের কাঁধে হাত দিয়ে ফেলুদার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'দ্যাটস্ দা ট্রাবল। কাকে যে সত্যি করে চেনে আর কাকে যে পূর্বজন্মে চিনত তা বলা মুশকিল।'

লক্ষ করলাম মুকুলের হাতে কী জানি একটা কাগজের টুকরো চক চক করছে। ফেলুদাও দেখেছিল সেটা। বলল, 'তোমার হাতের কাগজটা একবার দেখব?'

মুকুল কাগজটা দিল। একটা দু' ইঞ্চি লম্বা আধ ইঞ্চি চওড়া সোনালি রাংতা।

'এটা কোথায় পেলে মুকুল?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

'এইখানে', বলে মুকুল ঘাসের দিকে আঙুল দেখাল।

'এটা আমি রাখতে পারি?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

'না। ওটা আমি পেয়েছি।' সেই একই সুর। একই ঠাণ্ডা গলার স্বর। অগত্যা ফেলুদা কাগজটা ফেরত দিয়ে দিল।

ডক্টর হাজরা বললেন, 'চলো মুকুল, ঘরে যাই। হাত-মুখ ধুয়ে তারপর খেতে যাবো আমরা। চলি মিস্টার মিত্তির। কাল ঠিক সাড়ে সাতটায় আর্লি ব্রেকফাস্ট করে বেরোচ্ছি আমরা।'

খেতে যাবার আগেই ফেলুদা সুধীরবাবুকে পৌঁছ-খবর আর মুকুলের খবর দিয়ে একটা পোস্টকার্ড লিখে দিয়েছিল। স্নানটান সেরে যখন ডাইনিং রুমে পৌঁছেছি ততক্ষণে ডক্টর হাজরা আর মুকুল ঘরে চলে গেছেন। মন্দারবাবুকে দেখলাম উল্টো দিকের কোনায় সেই অবাঙালী ভদ্রলোকের সঙ্গে বসে পুডিং খাচ্ছেন। আমাদের সুপ আসতে আসতে তাঁরা উঠে পড়লেন। দরজার দিকে যাবার পথে মন্দার বোস হাত তুলে গুডনাইট জানিয়ে গেলেন।

দু'দিন ট্রেনে পথ চলে বেশ ক্লান্ত লাগছিল। ইচ্ছে ছিল, খেয়ে এসেই ঘুমিয়ে পড়ব, কিন্তু ফেলুদার জন্য একটুক্ষণ জেগে থাকতে হল। ফেলুদা তার নীল খাতা নিয়ে সিগারেট ধরিয়ে সোফায় বসেছে, আর আমি খাটে গিয়ে শুয়েছি। সঙ্গে অ্যান্টি-মশা মলম ছিল বলে আর মশারি টাঙাতে দিইনি।

ফেলুদা ডট পেনের পেছনটা টিপে নিবটা বার করে নিয়ে বলল, 'কার কার সঙ্গে আলাপ হল বল।'

বললাম, 'কবে থেকে শুরু করব?'

'সুধীর ধরের আসা থেকে।'

'তাহলে প্রথমে সুধীরবাবু। তারপর শিবরতন। তারপর নীলু। তরপর





শিবরতনবাবুর চাকর—'

'নাম কী?'

'মনে নেই।'

'মনোহর। তারপর?'

'তারপর জটায়ু।'

'আসল নাম কী?'

'লালমোহন।'

'পদবী?'

'পদবী...পদবী... গাঙ্গুলী।'

'গুড।'

ফেলুদা লিখে চলেছে। আমিও বলে চললাম।

'তারপর সেই লাল জামা পরা লোকটা।'

'আলাপ হয়েছিল তার সঙ্গে?'

'না—তা হয়নি—'

'ঠিক আছে। নেক্সট?'

'মন্দার বোস। আর তার সঙ্গে যে লোকটা ছিল।'

'আর মুকুল ধর, ডক্টর—'

'ফেলুদা!'

আমার চিৎকারে ফেলুদার কথা থেমে গেল। আমার চোখ পড়েছে ফেলুদার বিছানার উপর। কী যেন একটা বিশ্রী জিনিস বালিশের তলা থেকে বেরোতে চেষ্টা করছে। আমি সেদিকে আঙুল দেখালাম।

ফেলুদা তড়াক করে লাফিয়ে উঠে এসে বালিশটাকে সরিয়ে ফেলতেই একটা কাঁকড়া বিছে বেরিয়ে পড়ল। ফেলুদা বিছানার চাদরটা ধরে একটা ঝটকা টান দিয়ে বিছেটাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে চটি দিয়ে তিনটে প্রচণ্ড চাপড় মেরে সেটাকে সাবাড় করল। তারপর একটা খবরের কাগজের টুকরো ছিঁড়ে নিয়ে থেঁতলানো বিছেটাকে তার মধ্যে তুলে বাথরুমে গিয়ে পিছনের দরজাটা খুলে কাগজটাকে পুঁটলি পাকিয়ে বাইরে ফেলে দিল। তারপর ফিরে এসে বলল, 'জমাদারের আসার দরজাটা খোলা ছিল, তাই এ ব্যাটা ঢুকতে পেরেছে। নে, তুই এবার ঘুমিয়ে পড়। কাল ভোরে ওঠা আছে।'

আমার কিন্তু মোটেই অতটা নিশ্চিন্ত লাগছিল না। আমার মনে হচ্ছিল—নাঃ, থাক। যদি আমার টেলিপ্যাথির জোর থাকে, তাহলে হয়ত বিপদের কথা বেশি ভাবলেই বিপদ এসে পড়বে। তার চেয়ে ঘুমোনোর চেষ্টা দেখি।

॥ ৬ ॥

পরদিন সকালে উঠে দাঁতটাত মেজে যেই ঘর থেকে বেরিয়েছি অমনি একটা চেনা গলায় শুনলাম, 'গুড মর্নিং !' জটায়ু হাজির। ফেলুদা আগেই বারান্দায় বেরিয়ে বেতের চেয়ারে বসে চায়ের অপেক্ষা করছিল। লালমোহনবাবু চোখ গোল গোল করে বললেন, 'ওঃ—কী থ্রিলিং জায়গা মশাই ! ফুল অফ পাওয়ারফুল সাস্‌পিশাস্ ক্যারেকটারস্ !'

'আপনি অক্ষত আছেন তো ?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

'কী বলচেন মশাই ! এখানে এসে দারুণ ফিট লাগছে। আজ আমাদের লজের ম্যানেজারকে পাঞ্জায় চ্যালেঞ্জ করেছিলুম। ভদ্রলোক রাজী হলেন না।' তারপর এগিয়ে এসে ফিসফিস করে বললেন, 'আমার কাছে একটি অস্ত্র আছে সুটকেসে—'

'গুলতি ?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

'নো স্যার ! একটি নেপালী ভোজালি। খাস কাটমুণ্ডুর জিনিস। কেউ অ্যাটাক করলে জয় মা বলে চালিয়ে দেবো পেটের মধ্যে, তারপর যা থাকে কপালে। অনেকদিনের শখ একটা ওয়েপনের কালেকশন করব, বুঝেছেন।'

আমার আবার হাসি পেলো, কিন্তু ক্রমেই সংযম অভ্যেস হয়ে আসছে, তাই সামলে গেলাম। লালমোহনবাবু ফেলুদার পাশের চেয়ারে বসে বললেন, 'আজকের প্ল্যান কী আমাদের ? ফোর্ট দেখতে যাচ্ছেন না ?'

ফেলুদা বলল, 'যাচ্ছি বটে, তবে এখানে নয়, বিকানির।'

'হঠাৎ আগেভাগে বিকানির ? কী ব্যাপার ?'

'সঙ্গী পাওয়া গেছে। গাড়ি যাচ্ছে একটা।'

বারান্দার পশ্চিম দিক থেকে আরেকটা গুড মর্নিং শোনা গেল। গ্লোব-ট্রটার আসছেন। 'ঘুম হল ভালো ?'

লালমোহনবাবু দেখলাম মন্দার বোসের মিলিটারি গোঁফ আর জাঁদরেল চেহারার দিকে বেশ প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখছেন। ফেলুদা দু'জনের আলাপ করিয়ে দিলেন।

'আরেব্বাস ! গ্লোব-ট্রটার ?' লালমোহনবাবুর চোখ ছানাবড়া। 'আপনাকে তো তাহলে কালটিভেট করতে হচ্ছে মশাই। অনেক লোমহর্ষক অভিজ্ঞতা আছে নিশ্চয়ই আপনার !'

'কোন রকমটা চাই আপনার ?' মন্দার বোস হেসে বললেন, 'এক ক্যানিবলের হাঁড়িতে সেদ্ধ হওয়াটাই বাদ ছিল, বাকি প্রায় সব রকমই হয়েছে।'





মুকুল যে কখন বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে তা টেরই পাইনি। এখন দেখলাম সে চুপচাপ একধারে দাঁড়িয়ে বাগানের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

এবার ডক্টর হাজরাও তৈরি হয়ে বেরিয়ে এলেন। তাঁর এক কাঁধে একটা ফ্লাস্ক, আরেকটায় একটা বাইনোকুলার, আর গলায় ঝুলছে একটা ক্যামেরা। বললেন, 'প্রায় সাড়ে চার ঘণ্টার পথ। আপনাদের ফ্লাস্ক থাকলে সঙ্গে নিয়ে নেবেন। পথে কী পাওয়া যাবে ঠিক নেই। আমি হোটেলে বলে দিয়েছি—চারটে প্যাক্‌ড লাঞ্চ দিয়ে দেবে।'

মন্দার বোস বললেন, 'কোথায় চললেন আপনারা সব ?'

বিকানিরের কথা শুনে ভদ্রলোক মেতে উঠলেন—

'যাওয়াই যদি হয় তাহলে সব এক সঙ্গে গেলেই হয় !'

'দি আইডিয়া !' বললেন জটায়ু।

ডক্টর হাজরা একটু কাচুমাচু ভাব করে বললেন, 'সবসুদ্ধ তাহলে ক'জন যাচ্ছি আমরা ?'

মন্দার বোস বললেন, 'এক গাড়িতে সবাই যাবার প্রশ্নই ওঠে না। আই উইল অ্যারেঞ্জ ফর অ্যানাদার ট্যাক্সি। আমার সঙ্গে মিস্টার মাহেশ্বরীও যাবেন বোধহয়।'

'আপনি যাবেন কি ?' লালমোহনবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন ডক্টর হাজরা।

'গেলে শেয়ারে যাবো। কারুর স্কন্ধে চাপতে রাজী নই। আপনারা চারজন একটাতে যান। আমি মিস্টার গ্লোব-ট্রটারের সঙ্গে আছি।'

বুঝলাম, ভদ্রলোক মন্দারবাবুর কাছ থেকে গল্প শুনে ওঁর প্লটের স্টক বাড়াতে চাচ্ছেন। অলরেডি উনি কম করে পঁচিশখানা অ্যাডভেঞ্চার উপন্যাস লিখেছেন। ভালোই হল ; এক গাড়িতে পাঁচজন হলে একটু বেশি ঠাসাঠাসি হত। মন্দারবাবু ম্যানেজারকে বলে আরেকটা ট্যাক্সির বন্দোবস্ত করে ফেললেন। লালমোহনবাবু নিউ বম্বে লজে তৈরি হতে চলে গেলেন। যাবার সময় বলে গেলেন, 'আমাকে কাইন্ডলি পিক আপ করে নেবেন। আমি হাফ অ্যান আওয়ারের মধ্যে রেডি হয়ে থাকছি।'

আগেই বলে রাখি—বিকানিরের কেল্লাও মুকুল একবার দেখেই বাতিল করে দিয়েছিল। কিন্তু সেটাই আজকের দিনের আসল ঘটনা নয়। আসল ঘটনা ঘটল দেবীকুণ্ডে, আর সেটা থেকেই বুঝতে পারলাম যে, আমরা সত্যিই দুর্ধর্ষ দুশমনের পাল্লায় পড়েছি।

বিকানির যাবার পথে বিশেষ কিছু ঘটেনি, কেবল মাইল ষাটেক যাবার পর একটা বেদের দলকে দেখতে পেলাম রাস্তার ধারে সংসার পেতে বসেছে। মুকুল গাড়ি থামাতে বলে তাদের মধ্যে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে এসে বলল যে, তাদের চেনে।

এরপরে ফেলুদার সঙ্গে ডক্টর হাজরার কিছু কথাবার্তা হয়েছিল মুকুলকে নিয়ে, সেটা এখানে বলে রাখি। এইসব কথা মুকুল ড্রাইভারের পাশে বসে শুনতে পেয়েছিল কিনা জানি না ; কিন্তু পেলেও তার হাবভাবে সেটা কিছুই বোঝা যায়নি।

ফেলুদা বলল, 'আচ্ছা ডক্টর হাজরা, মুকুল তার পূর্বজন্মের কী কী ঘটনা বা জিনিসের কথা বলে সেটা একবার বলবেন ?'

হাজরা বললেন, 'যে জিনিসটার কথা বার বারই বলে সেটা হচ্ছে সোনার কেল্লা। সেই কেল্লার কাছেই নাকি ওর বাড়ি ছিল। সেই বাড়ির মেঝের তলায় নাকি ধনরত্ন পোঁতা ছিল। যেরকমভাবে বলে তাতে মনে হয় যে এই ধনরত্ন লুকিয়ে রাখার ব্যাপারটা ওর সামনেই ঘটেছিল। এ ছাড়া যুদ্ধের কথা বলে। বলে, অনেক হাতি, অনেক ঘোড়া, সেপাই, কামান, ভীষণ শব্দ, ভীষণ চীৎকার। আর বলে উটের কথা। উটের পিঠে সে চড়েছে। আর ময়ূর। ময়ূরে নাকি ওর হাতে ঠোকর মেরেছিল। রক্ত বার করে দিয়েছিল। আর বলে বালির কথা। বালি দেখলেই কীরকম চঞ্চল হয়ে উঠছে সেটা লক্ষ করেননি ?'

বিকানির পৌঁছলাম পৌনে বারোটায়। শহরে পৌঁছবার কিছু আগে থেকেই রাস্তা ক্রমে চড়াই উঠেছে ; এই চড়াইয়ের উপরেই পাঁচিল দিয়ে ঘেরা শহর। আর শহরের মধ্যে সবচেয়ে চোখে পড়ার মতো জিনিস হচ্ছে লালচে রঙের পাথরের তৈরি প্রকাণ্ড দুর্গ।

আমাদের গাড়ি একেবারে সোজা দুর্গের দিকে নিয়ে যাওয়া হল। লক্ষ করলাম, যতই কাছে যাচ্ছি ততই যেন দুর্গটাকে আরো বড় বলে মনে হচ্ছে। বাবা ঠিকই বলেছিলেন। রাজপুতরা যে দারুণ শক্তিশালী জাত ছিল সেটা তাদের দুর্গের চেহারা দেখলেই বোঝা যায়।

দুর্গের গেটের সামনে গিয়ে ট্যাক্সি থামার সঙ্গে সঙ্গেই মুকুল বলে উঠল, 'এখানে কেন থামলে ?'

ডক্টর হাজরা বললেন 'কেল্লাটা কি চিনতে পারছ মুকুল ?'

মুকুল গম্ভীর গলায় বলল, 'না। এটা বিচ্ছিরি কেল্লা। এটা সোনার কেল্লা না।'

আমরা সবাই গাড়ি থেকে নেমে বাইরে দাঁড়িয়েছিলাম। মুকুলের কথাটা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই কোত্থেকে জানি একটা কর্কশ আওয়াজ শোনা গেল আর তৎক্ষণাৎ মুকুল দৌড়ে এসে ডক্টর হাজরাকে দু হাতে জড়িয়ে ধরল। আওয়াজটা এল কেল্লার উল্টোদিকের পার্কটা থেকে।

ফেলুদা বলল, 'ময়ূরের ডাক। এরকম আগেও হয়েছে কি ?'

ডক্টর হাজরা মুকুলের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, 'কাল যোধপুরেই হয়েছিল। হি কান্ট স্ট্যান্ড পীকক্‌স।'





মুকুল দেখলাম ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। সে আবার সেই গম্ভীর অথচ মিষ্টি গলায় বলল, 'এখানে থাকব না।'

ডক্টর হাজরা ফেলুদাকে উদ্দেশ করে বললেন, 'আমি বরং গাড়িটা নিয়ে এখানকার সার্কিট হাউসে গিয়ে অপেক্ষা করছি। আপনারা অ্যাদ্দূর এসেছেন, একটু ঘুরেটুরে দেখে নিন। আমি গিয়ে গাড়িটা ফেরত পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপনাদের দেখা হলে সার্কিট হাউসে চলে আসবেন। তবে দুটোর বেশি দেরি করবেন না কিন্তু, তাহলে ওদিকে ফিরতে রাত হয়ে যাবে।'

ডক্টর হাজরার উদ্দেশ্য সফল হয়নি ঠিকই কিন্তু আমার তাতে বিশেষ দুঃখ নেই। এই প্রথম একটা রাজপুত কেল্লার ভিতরটা দেখতে পাব ভেবেই আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল।

কেল্লার গেটের দিকে যখন এগোচ্ছি তখন ফেলুদা আচমকা থমকে দাঁড়িয়ে আমার কাঁধে একটা চাপ দিয়ে বলল, 'দেখলি ?'

বললাম, 'কী জিনিস ?'

'সেই লোকটা।'

বুঝলাম ফেলুদা সেই লাল জামা পরা লোকটার কথা বলছে। কিন্তু ও যেদিকে তাকিয়ে রয়েছে সেদিকে কোনো লাল জামা দেখতে পেলাম না। অবিশ্যি লোকজন অনেক রয়েছে, কারণ কেল্লার গেটের বাইরেটা একটা ছোটখাটো বাজার। বললাম, 'কোথায় লোকটা ?'

'ইডিয়ট। তুই বুঝি লাল জামা খুঁজছিস ?'

'তবে কোন্ লোকের কথা বলছ তুমি ?'

'তোর মতো বোকসন্দর দুনিয়ায় নেই। তুই শুধু জামাই দেখেছিস, আর কিছুই দেখিসনি। ইট ওয়াজ দ্য সেম ম্যান, চাদর দিয়ে নাক অবধি ঢাকা। কেবল আজ পরেছিল নীল জামা। আমরা যখন বেদেদের দেখতে নেমেছিলাম, সেই সময় একটা ট্যাক্সি যেতে দেখি বিকানিরের দিকে। তাতে দেখেছিলাম এই নীল জামা।'

'কিন্তু এখানে কী করছে লোকটা ?'

'সেটা জানলে তো অর্ধেক বাজি মাত হয়ে যেত।'

লোকটা উধাও। মনে একটা উত্তেজনার ভাব নিয়ে কেল্লার বিশাল ফটক দিয়ে ভিতরে ঢুকলাম। ঢুকেই একটা বিরাট চাতাল, সেটার ডানদিকে বুকের ছাতি ফুলিয়ে কেল্লাটা দাঁড়িয়ে আছে। দেয়ালের খোপরে খোপরে পায়রার বাসা। বিকানির নাকি হাজার বছর আগে একটা সমৃদ্ধ শহর ছিল, যেটা বহুকাল হল বালির তলায় তলিয়ে গেছে। ফেলুদা বলল যে, কেল্লাটা চারশো বছর আগে রাজা রায় সিং প্রথম তৈরি করতে শুরু করেন। ইনি নাকি আকবরের একজন

বিখ্যাত সেনাপতি ছিলেন।

আমার মনের ভিতরটা কিছুক্ষণ থেকে খচখচ করছে একটা কথা ভেবে। লালমোহনবাবুরা এখনো এলেন না কেন? তাদের কি তাহলে রওনা হতে দেরি হয়েছে? নাকি রাস্তায় গাড়ি খারাপ হয়ে গেছে? যাক গে। ওদের কথা ভেবে আশ্চর্য ঐতিহাসিক জিনিস দেখার আনন্দ নষ্ট করব না।

যে জিনিসটা সবচেয়ে অদ্ভুত লাগল সেটা হল কেল্লার অস্ত্রাগার। এখানে যে শুধু অস্ত্রই রয়েছে তা নয়, আশ্চর্য সুন্দর একটা রুপোর সিংহাসনও রয়েছে, যার নাম আলম আম্বালি। এটা নাকি মোগল বাদশাহদের উপহার। এ ছাড়া রয়েছে যুদ্ধের বর্ম শিরস্ত্রাণ ঢাল তলোয়ার বল্লম ছোরা আর আরো কত কী! এক একটা তলোয়ার এত বিরাট আর এত তাগড়াই যে দেখলে বিশ্বাসই হয় না সেগুলো মানুষে হাতে নিয়ে চালাতে পারে। এগুলো দেখে জটায়ুর কথা যেই মনে পড়েছে, অমনি দেখি আমার টেলিপ্যাথির জোরে ভদ্রলোক হাজির। বিরাট কেল্লার বিরাট ঘরের বিরাট দরজার সামনে তাকে আরো খুদে আর আরো হাস্যকর মনে হচ্ছে।

লালমোহনবাবু আমাদের দেখতে পেয়ে এক গাল হেসে চারিদিকে চেয়ে শুধু বললেন, 'রাজপুতরা কি জায়েন্ট ছিল নাকি মশাই। এ জিনিস তো মানুষের হাতে ব্যবহার করার জিনিস নয়!'

যা ভেবেছিলাম তাই। সত্তর কিলোমিটারের মাথায় ওদের ট্যাক্সির একটা টায়ার পাংচার হয়। ফেলুদা বলল, 'আপনার সঙ্গের আর দু'জন কোথায়?'

'ওরা বাজারে কী সব কিনতে লেগেছে। আমি আর থাকতে না পেরে ঢুকে পড়লুম।'

আমরা ফুল মহল, গজ মন্দির, শীশ মহল আর গঙ্গা নিবাস দেখে যখন চিনি বুর্জে পৌঁছেছি, তখন মন্দার বোস আর মিস্টার মাহেশ্বরীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তাঁদের হাতে খবরের কাগজের মোড়ক দেখে বুঝলাম তাঁরা কেনাকাটা করেছেন। মন্দার বোস বললেন, 'ইউরোপে মধ্যযুগের দুর্গটুর্গগুলোতে যে অস্ত্র দেখেছি, আর এখানেও যা দেখলাম, তাতে একটা জিনিসই প্রমাণ করে : মানুষ জাতটা দিনে দিনে দুর্বল হয়ে আসছে, আর আমার বিশ্বাস সেই সঙ্গে তারা আয়তনেও ছোট হয়ে আসছে।'

'এই আমার মতো বলছেন?' লালমোহনবাবু হেসে বললেন।

'হ্যাঁ। ঠিক আপনারই মতো', মন্দার বোস বললেন, 'আমার বিশ্বাস আপনার ডাইমেনশনের লোক ষোড়শ শতাব্দীর রাজস্থানে একটিও ছিল না। ওহো—বাই দ্য ওয়ে—' মন্দারবাবু ফেলুদার দিকে ফিরলেন, 'আপনার জন্য এইটে এসে পড়েছিল সার্কিট হাউসে রিসেপশন ডেস্কে।'

ভদ্রলোক পকেট থেকে একটা খাম বার করে ফেলুদাকে দিলেন। তাতে





টিকিট নেই। বোঝাই যায় কোনো স্থানীয় লোক সেটা দিয়ে গেছে।

ফেলুদা চিঠি খুলতে খুলতে বলল, 'আপনাকে কে দিল?'

'আমরা যখন বেরোচ্ছি, তখন বাগ্রি বলে যে ছোকরাটা রিসেপশনে বসে, সেই দিল। বললে কে কখন রেখে গেছে জানে না।'

ফেলুদা 'এক্সকিউজ মি' বলে চিঠিটা পড়ে আবার খামে পুরে পকেটে রেখে দিল। তাতে কী লেখা আছে কিছুই বুঝতে পারলাম না, জিজ্ঞেসও করতে পারলাম না।

আরো আধঘণ্টা ঘোরার পর ফেলুদা ঘড়ি দেখে বলল, 'এবার সার্কিট হাউসে যেতে হয়।' কেল্লাটা ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছিল না, কিন্তু উপায় নেই।

কেল্লার বাইরে দুটো ট্যাক্সিই দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঠিক হল যে এবার আমরা একই সঙ্গে ফিরব। যখন ট্যাক্সিতে উঠছি, তখন ড্রাইভার বলল ডক্টর হাজরারা নাকি সার্কিট হাউসে যাননি। ইয়ো যো লেড়কা থা—ও নাকি বলেছে সার্কিট হাউসে যাবে না।

'তবে কোথায় গেছে ওরা?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

তাতে ড্রাইভার বলল, 'ওরা গেছে দেবীকুণ্ডে। সেটা আবার কী জায়গা? ফেলুদা বলল, ওখানে নাকি রাজপুত যোদ্ধাদের স্মৃতিস্তম্ভ আছে।

পাঁচ মাইল পথ, যেতে লাগল দশ মিনিট। জায়গাটা সত্যিই সুন্দর, আর তেমনি সুন্দর স্মৃতিস্তম্ভগুলো। পাথরের বেদীর উপর পাথরের থাম, তার উপর পাথরের ছাউনি, আর মাথা থেকে পা অবধি সুন্দর কারুকার্য। এই রকম স্মৃতিস্তম্ভ চারদিকে ছড়ানো রয়েছে কমপক্ষে পঞ্চাশটা। সমস্ত জায়গাটা গাছপালায় ভর্তি, সেই সব গাছে টিয়ার দল জটলা করছে, এ-গাছ থেকে ও-গাছ ফুরুত ফুরুত করে উড়ে বেড়াচ্ছে আর ট্যাঁ ট্যাঁ করে ডাকছে। এত টিয়া একসঙ্গে আমি কখনো দেখিনি।

কিন্তু ডক্টর হাজরা কোথায়? আর কোথায়ই বা মুকুল?

লালমোহনবাবুর দিকে চেয়ে দেখি উনি উসখুস করছেন। বললেন, 'ভেরি সাস্‌পিশাস্ অ্যান্ড মিস্টিরিয়াস্।'

'ডক্টর হাজরা!' মন্দার বোস হঠাৎ এক হাঁক দিয়ে উঠলেন। তাঁর ভারী গলার চীৎকারে এক ঝাঁক টিয়া উড়ে পালাল, কিন্তু ডাকের কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

আমরা ক'জনে খুঁজতে আরম্ভ করে দিলাম। স্মৃতিস্তম্ভে স্মৃতিস্তম্ভে জায়গাটা প্রায় একটা গোলকধাঁধার মতো হয়ে রয়েছে। তারই মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে ফেলুদাকে দেখলাম ঘাস থেকে দেশলাইয়ের বাক্স কুড়িয়ে নিয়ে পকেটে পুরল।

শেষকালে কিন্তু লালমোহনবাবুই আবিষ্কার করলেন ডক্টর হাজরাকে। তাঁর

চীৎকার শুনে আমরা দৌড়ে গিয়ে দেখি, একটা আমগাছের ছায়ায় শেওলাধরা বেদীর সামনে মুখ আর হাত পিছন দিকে বাঁধা অবস্থায় মাটিতে কুঁকড়ে পড়ে আছেন ডক্টর হাজরা। তাঁর মুখ দিয়ে একটা অদ্ভুত অসহায় গোঁ গোঁ শব্দ বেরোচ্ছে।

ফেলুদা হুমড়ি খেয়ে ভদ্রলোকের উপর পড়ে তাঁর হাতের বাঁধন আর মুখের গ্যাগ খুলে দিল। দেখেই মনে হল যেটা দিয়ে বাঁধা হয়েছে সেটা একটা পাগড়ি থেকে ছেঁড়া কাপড়।

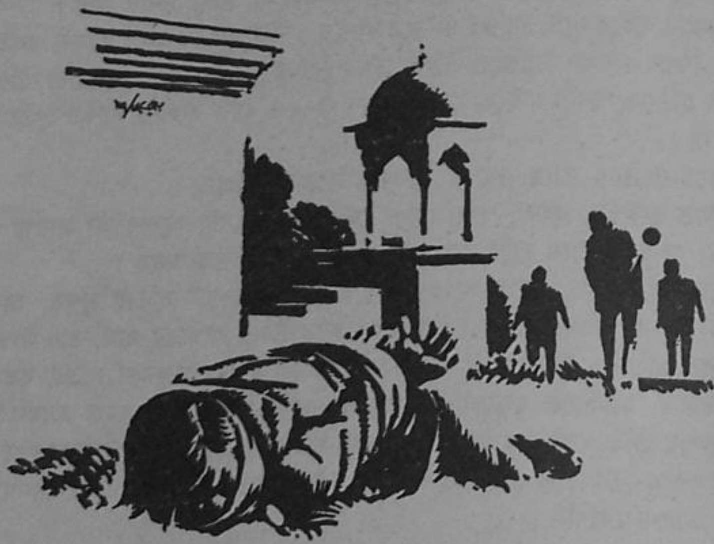

মন্দার বোস বললেন, 'ব্যাপার কী মশাই, এমন দশা হল কী করে ?'

সৌভাগ্যক্রমে ডক্টর হাজরা জখম হননি। তিনি মাটিতে ঘাসের উপরে বসে কিছুক্ষণ হাঁপালেন। তারপর বললেন, 'মুকুল বলল, সার্কিট হাউসে যাবে না। অগত্যা গাড়ি করে ঘুরতে লাগলাম। এখানে এসে তার জায়গাটা ভালো লেগে গেল। বলল—এগুলো ছত্রী। এগুলো আমি জানি। আমি নেবে দেখব।—নামলাম। ও এদিক ওদিক ঘুরছিল, আমি একটু গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়েছিলাম। এমন সময় পেছন থেকে আক্রমণ। হাত দিয়ে মুখটা চেপে মাটিতে উপুড় করে ফেলে হাঁটুটা দিয়ে মাথাটা চেপে রেখে হাত দুটো পিছনে বেঁধে ফেলল। তারপর মুখে ব্যান্ডেজ।'





'মুকুল কোথায় ?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল। তার গলার স্বরে উৎকণ্ঠা।

'জানি না। একটা গাড়ির আওয়াজ পেয়েছিলাম বটে আমাকে বাঁধবার কিছুক্ষণ পরেই।'

'লোকটার চেহারাটা দেখেননি ?' ফেলুদা প্রশ্ন করল।

ডক্টর হাজরা মাথা নাড়লেন। 'তবে স্ট্রাগল্-এর সময় তার পোশাকের একটা আন্দাজ পেয়েছিলাম। স্থানীয় লোকের পোশাক। প্যান্ট-সার্ট নয়।'

'দেয়ার হি ইজ !' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন মন্দার বোস।

অবাক হয়ে দেখলাম, একটা ছত্রীর পাশ থেকে মুকুল আপনমনে একটা ঘাস চিবোতে চিবোতে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। ডক্টর হাজরা একটা হাঁপ ছাড়ার শব্দ করে 'থ্যাঙ্ক গড' বলে মুকুলের দিকে এগিয়ে গেল।

'কোথায় গিয়েছিলে মুকুল ?'

কোনো উত্তর নেই।

'কোথায় ছিলে তুমি এতক্ষণ ?'

'ওইটার পিছনে।' মুকুল আঙুল দিয়ে একটা ছত্রীর দিকে দেখাল।

'ওরকম বাড়ি আমি দেখেছি।'

ফেলুদা বলল, 'যে লোকটা এসেছিল তাকে তুমি দেখেছিলে ?'

'কোন লোকটা ?'

ডক্টর হাজরা বললেন, 'ওর দেখার কথা নয়। এখানে এসেই ও দৌড়ে এক্সপ্লোর করতে চলে গেছে। বিকানির এসে এরকম যে একটা কিছু ঘটতে পারে সেটাও ভাবিনি, তাই আমিও ওর জন্য চিন্তা করিনি।'

তা সত্ত্বেও ফেলুদা আবার প্রশ্ন করল, 'তুমি দেখনি লোকটাকে—যে ডক্টর হাজরার হাত-মুখ বাঁধল ?'

'আমি সোনার কেল্লা দেখব।'

বুঝলাম মুকুলকে কোনো প্রশ্ন করা বৃথা।

ফেলুদা হঠাৎ বলল, 'আর টাইম্ ওয়েস্ট করে লাভ নেই। একদিক দিয়ে ভালোইযে মুকুল আপনার সঙ্গে বা আপনার কাছাকাছি ছিল না। থাকলে হয়ত তাকে নিয়েই উধাও হত লোকটা। যদি সে লোক যোধপুর ফিরে গিয়ে থাকে তাহলে যথেষ্ট স্পীডে গাড়ি চালালে হয়ত এখনো তাকে ধরা যাবে।'

দু' মিনিটের মধ্যে আমরা গাড়িতে উঠে রওনা হয়ে গেলাম। লালমোহনবাবু এবার আমাদের সঙ্গে এলেন। বললেন, 'ও লোকগুলো বড্ড ড্রিঙ্ক করে। আমার আবার মদের গন্ধ সহ্য হয় না।'

পাঞ্জাবী ড্রাইভার হরমিত সিং ষাট মাইল পর্যন্ত স্পীড তুলল গাড়িতে। এক জায়গায় রাস্তার মাঝখানে একটা ঘুঘু বসেছিল, সেটা উড়ে পালাতে গিয়ে

আমাদের গাড়ির উইন্ডস্ক্রীনে ধাক্কা খেয়ে মরে গেল। আমি আর মুকুল সামনে বসেছিলাম। একবার পিছন ফিরে দেখলাম, লালমোহনবাবু ফেলুদা আর ডক্টর হাজরার মাঝখানে কুঁকড়ে চোখ বন্ধ করে বসে আছেন। তাঁর মুখ ফ্যাকাশে হলেও ঠোঁটের কোণে একটা হাসি দেখে বুঝলাম, তিনি অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ পেয়েছেন ; হয়ত তাঁর সামনের গল্পের প্লটও মাথায় এসে গেছে।

শ'খানেক মাইল আসার পর বুঝতে পারলাম যে, শয়তানের গাড়ি ধরতে পারার কোনো সম্ভাবনা নেই। সে গাড়িটাও যে নতুন নয়, আর তাতেও যে স্পীড ওঠে না, একথা ভাবলে চলবে কেন !

যোধপুর যখন পৌঁছলাম, তখন শহরের বাতি জ্বলে উঠেছে। ফেলুদা বলল, 'লালমোহনবাবু, আপনাকে নিউ বোম্বে লজে নামিয়ে দেব তো ?'

ভদ্রলোক মিহি গলায় বললেন, 'তা তো বটেই—আমার জিনিসপত্তর তো সব সেখানেই রয়েছে ; কিন্তু ভাবছিলুম খাওয়াদাওয়া করে যদি আপনাদের ওখানে...মানে...'

'বেশ তো', ফেলুদা আশ্বাসের সুরে বলল, 'জিজ্ঞেস করে দেখব, সার্কিট হাউসে ঘর খালি আছে কিনা। আপনি বরং নটা নাগাদ একটা টেলিফোন করে জেনে নেবেন।'

আমি ভাবছি আজকের ঘটনার কথা। শক্ত লোকের পাল্লায় পড়েছি আমরা, সে কথা বেশ বুঝতে পারছি। এ লোকই কি সেই লাল জামা পরা লোক ? যে আজ বিকানির গিয়েছিল নীল জামা পরে ? জানি না। এখন পর্যন্ত কিছুই বুঝতে পারছি না। আমার মনে হয় ফেলুদাও পারছে না। যদি পারত তাহলে ওর মুখের ভাবই অন্য রকম হয়ে যেতো। অ্যাদ্দিন ওর সঙ্গে থেকে আর ওর তদন্তের কায়দাটা দেখে আমি এটা খুব ভালো করেই জেনেছি।

সার্কিট হাউসে পৌঁছে যে যার ঘরের দিকে গেলাম। তিন নম্বরে ঢোকার আগে ফেলুদা ডক্টর হাজরাকে বলল, 'কিছু মনে করবেন না, আমি এই কাপড়টা আমার কাছে রাখছি।' ডক্টর হাজরাকে যে কাপড়টা দিয়ে বাঁধা হয়েছিল সেটা ফেলুদা সঙ্গে নিয়ে নিয়েছিল।

হাজরা বললেন, 'স্বচ্ছন্দে।' তারপর ফেলুদার দিকে এগিয়ে এসে গলা নামিয়ে বললেন, 'বুঝতেই তো পারছেন প্রদোষবাবু, ব্যাপার গুরুতর। যেটা আশঙ্কা করা গিয়েছিল, সেটাই হতে চলেছে। আমি কিন্তু এতটা গোলমাল হবে সেটা অনুমান করিনি।'

ফেলুদা বলল, 'আপনি ভাবছেন কেন ? আমি তো রয়েছি। আপনি নির্ভয়ে নিজের কাজ চালিয়ে যান। আমার বিশ্বাস, আপনি যদি আজ দেবীকুণ্ডে না গিয়ে সার্কিট হাউসে যেতেন তাহলে আপনাকে এতটা নাজেহাল হতে হত না।





অবিশ্যি মুকুলকে যে কিডন্যাপ করতে পারেনি লোকটা এটাই ভাগ্য। এবার থেকে আমাদের কাছাকাছি থাকবেন, তাহলে দুর্যোগের ভয়টা অনেক কমবে।'

ডক্টর হাজরার মুখ থেকে দুশ্চিন্তার ভাবটা গেল না। বললেন, 'আমি কিন্তু আমার নিজের জন্য ভাবছি না। বৈজ্ঞানিকদের গবেষণার ব্যাপারে অনেক রিস্ক নিতে হয়। ভাবছি আপনাদের দুজনের জন্য। আপনারা তো একেবারে বাইরের লোক।'

ফেলুদা একটু হেসে বলল, 'ধরে নিন আমিও একজন বৈজ্ঞানিক, আমিও গবেষণা করছি, আর সেই কারণে আমিও রিস্ক নিচ্ছি।'

মুকুল এতক্ষণ বারান্দার এ-মাথা থেকে ও-মাথা পায়চারি করছিল, ডক্টর হাজরা এবার তাকে ডেকে নিয়ে আমাদের গুড নাইট জানিয়ে অন্যমনস্কভাবে তাঁর ঘরে চলে গেলেন। আমরাও আমাদের ঘরে ঢুকলাম। বেয়ারাকে ডেকে ঠাণ্ডা কোকাকোলা আনতে বলে ফেলুদা সোফায় বসে পকেট থেকে সিগারেট আর লাইটার বার করে চিন্তিতভাবে সেগুলোকে টেবিলের উপর রাখল। তারপর অন্য পকেট থেকে বের করল একটা দেশলাই—যেটা দেবীকুণ্ডে কুড়িয়ে পেয়েছিল। টেক্কা-মার্কা দেশলাই। বাক্স খালি। সেটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, 'এই যে রেলে আসতে এতগুলো স্টেশনে এতগুলো পান-সিগারেটওয়ালাকে দেখলি, তাদের কারুর কাছে টেক্কা দেশলাই ছিল কিনা লক্ষ করেছিলি ?'

আমি সত্যি কথাটা বললাম। 'না ফেলুদা, লক্ষ করিনি।'

ফেলুদা বলল, 'পশ্চিম অঞ্চলের কোনো দোকানে টেক্কা দেশলাই থাকার কথা নয়। রাজস্থানে টেক্কা বিক্রি হয় না। এ দেশলাই রাজস্থানের বাইরে থেকে আনা।'

'তার মানে এটা সেই লাল জামা পরা লোকটার নয় ?'

'তোর প্রশ্নটা খুবই কাঁচা হল। প্রথমত রাজস্থানী পোশাক পরলেই একটা লোক রাজস্থানী হয় না। ওটা যে-কেউ পরতে পারে। আর দ্বিতীয়ত, ওই লোক ছাড়াও আরো অনেকেই আজ দেবীকুণ্ডে গিয়ে কুকীর্তিটা করার সুযোগ পেয়েছে।'

'তা তো বটেই ! কিন্তু তাদের তো কাউকেই আমরা চিনি না, কাজেই ও নিয়ে ভেবে কী লাভ ?'

'এটাও খুব কাঁচা কথা হল। মাথা খাটাতে শিখলি না এখনো তুই। লালমোহন, মন্দার বোস এবং মাহেশ্বরী—এরা কত দেরীতে কেল্লায় পৌঁছেছে সেটা ভেবে দ্যাখ্। আর তারপর ভেবে দ্যাখ্—'

'বুঝেছি, বুঝেছি !'

সত্যিই তো ! এটা তো আমার মাথাতেই আসেনি ওদের আসতে প্রায়

পঁয়তাল্লিশ মিনিট দেরি হয়েছিল। লালমোহনবাবু বললেন, গাড়ির টায়ার পাংচার হয়েছিল। যদি না হয়ে থাকে? যদি তিনি মিথ্যে কথা বলে থাকেন? কিংবা সেটা যদি সত্যি হয়ে থাকে, আর লালমোহনবাবু যদি নির্দোষ হয়ে থাকেন, মন্দার বোস আর মাহেশ্বরী তো বাজার না করে দেবীকুণ্ডে গিয়ে থাকতে পারেন।

ফেলুদা এবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পকেট থেকে আরেকটা জিনিস বার করল। সেটা দেখেই হঠাৎ বুকটা ধড়াস করে উঠল। এটার কথা এতক্ষণ মনেই ছিল না। এটা সেই মন্দার বোসের দেওয়া চিঠিটা।

'ওটা কার চিঠি ফেলুদা?' কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'জানি না', বলে ফেলুদা চিঠিটা আমার দিকে এগিয়ে দিল। হাতে নিয়ে দেখি সেটা ইংরিজিতে লেখা চিঠি। মাত্র একটা লাইন—বড় হাতের অক্ষরে ডট পেন দিয়ে লেখা—

'ইফ ইউ ভ্যালু ইয়োর লাইফ—গো ব্যাক টু ক্যালকাটা ইমিডিয়েটলি।'

অর্থাৎ তোমার জীবনের প্রতি যদি তোমার মায়া থাকে, তাহলে এক্ষুনি কলকাতায় ফিরে যাও।

আমার হাতে চিঠিটা কাঁপতে লাগল। আমি চট করে সেটা টেবিলের উপর রেখে হাত দুটোকে কোলের উপর জড়ো করে নিজেকে স্টেডি করার চেষ্টা করলাম।

'কী করবে ফেলুদা?'

সিলিং-এর ঘুরন্ত পাখাটার দিক থেকে দৃষ্টি না সরিয়ে ফেলুদা প্রায় আপন মনেই বলল, 'মাকড়সার জাল...জিয়োমেট্রি....। এখন অন্ধকার...দেখা যাচ্ছে না...রোদ উঠলে জালে আলো পড়বে—চিক্ চিক্ করবে...তখন ধরা পড়বে জালের নকশা!...এখন শুধু আলোর অপেক্ষা...'

॥ ৭ ॥

কাল মাঝরাত্তিরে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল একবার, তখন সময় ক'টা জানি না, দেখলাম ফেলুদা বেড-সাইড ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে তার নীল খাতায় কী জানি লিখছে। ও কত রাত পর্যন্ত কাজ করেছিল জানি না। কিন্তু সকাল সাড়ে ছ'টায় উঠে দেখলাম, ও তার আগেই উঠে দাড়িটাড়ি কামিয়ে রেডি। ও বলে, মানুষের ব্রেন যখন খুব বেশি কাজ করে, তখন ঘুম আপনা থেকেই কমে যায়; কিন্তু তাতে নাকি শরীর খারাপ হয় না। অন্তত ওর তো তাই ধারণা, আর ওর শরীর গত দশ বছরে একদিনের জন্যেও খারাপ হয়েছে বলে তো মনে পড়ে না। আমি জানতাম যে যোধপুরে এসেও ও যোগব্যায়াম বন্ধ করেনি। আজকেও জানি আমার ঘুম ভাঙার আগেই ওর সে-কাজটা সারা হয়ে গেছে।





ডাইনিং রুমে ব্রেকফাস্ট খেতে গিয়ে সকলের সঙ্গেই দেখা হল। লালমোহনবাবু কাল রাত্রেই সার্কিট হাউসে চলে এসেছিলেন। তিনি বারান্দার পশ্চিম অংশটাতে মন্দার বোসের দুটো ঘর পরেই রয়েছেন। ভদ্রলোক ডিমের অমলেট খেতে খেতে বললেন, তাঁর নাকি চমৎকার একটা প্লট মাথায় এসেছে। ডক্টর হাজরা একদম মুষড়ে পড়েছেন; বললেন যে রাত্রে নাকি তাঁর ভালো ঘুম হয়নি। একমাত্র মুকুলই দেখলাম নির্বিকার।

মন্দার বোস আজ প্রথম সরাসরি ডক্টর হাজরার সঙ্গে কথা বললেন—

'কিছু মনে করবেন না মশাই, আপনি যে উদ্ভট জিনিস নিয়ে রিসার্চ করছেন, তাতে এ ধরনের গণ্ডগোল হবেই। যে দেশে কুসংস্কারের এত ছড়াছড়ি, সে দেশে এসব জিনিস বেশি না ঘাঁটানোই ভালো। শেষকালে দেখবেন, ঘরে ঘরে সব কচি ছোকরারা নিজেদের জাতিস্মর বলে ক্লেম করছে। তলিয়ে দেখলে দেখবেন, ব্যাপারটা আর কিছুই না, তাদের বাপেরা একটু পাবলিসিটি চাইছে, ব্যস। তখন আপনি ঠ্যালা সামলাবেন কী করে? ক'টা ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে বিদেশে বিভুঁইয়ে চরে বেড়াবেন?'

ডক্টর হাজরা কোনো মন্তব্য করলেন না। লালমোহনবাবু এর-ওর মুখের দিকে চাইলেন, কারণ জাতিস্মর ব্যাপারটা উনি এখনো কিছু জানেন না।

ফেলুদা আগেই বলেছিল যে ব্রেকফাস্ট সেরে একটু বাজারের দিকে যাবে। আমি জানতাম সেটা নিশ্চয়ই শুধু শহর দেখার উদ্দেশ্যে নয়। পৌনে আটটার সময় আমরা বেরিয়ে পড়লাম। দু'জন নয়, তিনজন। লালমোহনবাবুও আমাদের সঙ্গ নিলেন। আমি এর মধ্যে দু-একবার ভদ্রলোককে দুশমন হিসেবে কল্পনা করার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু প্রতিবারই এত হাসি পেল যে বাধ্য হয়ে সেটা মন থেকে দূর করতে হল।

সার্কিট হাউসের দিকটা নিরিবিলি আর খোলামেলা হলেও শহরটা গিজগিজে। প্রায় সব জায়গা থেকেই পুরানো পাঁচিলটা দেখা যায়। সেই পাঁচিলের গায়ে দোকানের সারি, টাঙ্গার লাইন, লোকের থাকবার বাড়ি আর আরো কত কী। পাঁচশো বছর আগেকার শহরের চিহ্ন আজকের শহরের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গেছে।

আমরা এ-দোকান সে-দোকান দেখতে দেখতে হেঁটে চলেছি। ফেলুদা কিছু একটা খুঁজছে সেটা বুঝতে পারলাম, কিন্তু সেটা যে কী সেটা বুঝলাম না। লালমোহনবাবু হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, 'হাজরা কিসের ডাক্তার বলুন তো? আজ আবার টেবিলে মিস্টার ট্রটার কী সব বলছিলেন...'

ফেলুদা বলল, 'হাজরা একজন প্যারাসাইকলজিস্ট।'

'প্যারাসাইকলজিস্ট?' লালমোহনবাবুর ভুরু কুঁচকে গেল। 'সাইকলজির

আগে যে আবার প্যারা বসে সেটা তো জানতুম না মশাই। টাইফয়েডের আগে বসে সেটা জানি। তার মানে কি হাফ-সাইকলজি—প্যারা-টাইফয়েড যেমনি হাফ-টাইফয়েড ?'

ফেলুদা বলল, 'হাফ নয়, প্যারা মানে হচ্ছে অ্যাবনরম্যাল। মনস্তত্ত্ব ব্যাপারটা এমনই ধোঁয়াটে ; তার মধ্যেও আবার যে দিকটা বেশি ধোঁয়াটে, সেটা প্যারাসাইকলজির আওতারে পড়ে।'

'আর জাতিস্মরের কথা কী যেন বলছিলেন !'

'মুকুল ইজ এ জাতিস্মর। অন্তত তাই বলা হয় তাকে।'

লালমোহনবাবুর মুখ হাঁ হয়ে গেল।

'আপনি প্লটের অনেক খোরাক পাবেন', ফেলুদা বলল, 'ছেলেটি পূর্বজন্মে দেখা একটা সোনার কেল্লার কথা বলে। আর সে নাকি একটা বাড়িতে থাকত যার মাটিতে গুপ্তধন পোঁতা ছিল।'

'আমরা কি সেই সবের খোঁজে যাচ্ছি নাকি মশাই ?' লালমোহনবাবুর গলা ঘড়ঘড়ে হয়ে গেছে।

'আপনি যাচ্ছেন কিনা জানি না, তবে আমরা যাচ্ছি।'

লালমোহনবাবু রাস্তার মাঝখানে দু-হাত দিয়ে খপ করে ফেলুদার হাত ধরে ফেলল।

'মশাই—চান্স অফ এ লাইফটাইম। আমায় ফেলে ফস্ করে কোথাও চলে যাবেন না—এইটেই আমার রিকোয়েস্ট।'

'এরপর কোথায় যাবো এখনো কিছুই ঠিক হয়নি।'

লালমোহনবাবু কী জানি ভেবে বললেন, 'মিস্টার ট্রটার কি আপনাদের সঙ্গে যাবেন নাকি ?'

'কেন ? আপনার আপত্তি আছে ?'

'লোকটা পাওয়ারফুলি সাস্‌পিশাস্ !'

রাস্তার একধারে একটা জুতোওয়ালা বসেছে, তার চারিদিকে ঘিরে নাগরার ছড়াছড়ি। এখানকার লোকেরা এই ধরনের নাগরাই পরে। ফেলুদা জুতোগুলোর সামনে দাঁড়াল।

'পাওয়ারফুল তো জানি। সাস্‌পিশাস্ কেন ?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

'কাল গাড়িতে যেতে যেতে খুব বাক্‌তাল্লা মারছিল। বলে—ট্যাঙ্গানিকায় নাকি নেকড়ে মেরেছে নিজে বন্দুক দিয়ে। অথচ আমি জানি যে সারা আফ্রিকার কোনো তল্লাটে নেকড়ে জানোয়ারটাই নেই। মার্টিন জনসনের বই পড়েছি আমি—আমার কাছে ধাপ্পা !'

'আপনি কী বললেন ?'





'কী আর বলব ? ফস্ করে মুখের ওপর তো লায়ার বলা যায় না ! দু' জনের মাঝখানে স্যান্ডউইচ হয়ে বসে আছি। আর লোকটার ছাতি দেখেছেন তো ? কমপক্ষে ফটিফাইভ ইঞ্চেজ। আর রাস্তার দু'ধারে দেখছি ইয়া ইয়া মনসার ঝোপ্‌ড়া—কনট্রাডিক্ট করলুম, আর অমনি কোলপাঁজা করে তুলে নিয়ে যদি ওই একটা ঝোপ্‌ড়ার পেছনে ফেলে দিয়ে চলে যায়—ইন নো টাইম মশাই শকুনির স্কোয়াড্রন এসে ল্যান্ড করে ফিস্টি লাগিয়ে দেবে।'

'আপনার লাশে ক'টা শকুনের পেট ভরবে বলুন তো ?'

'হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ...'

ফেলুদা ইতিমধ্যে পায়ের স্যান্ডেল খুলে নাগরা পরে পায়চারি শুরু করে দিয়েছে। লালমোহনবাবু বললেন, 'ভেরি পাওয়ারফুল শুজ—কিনছেন নাকি ?'

'একটা পরে দেখুন না,' ফেলুদা বলল।

ভদ্রলোকের পায়ের মাপের মতো ছোট জুতো অবিশ্যি দোকানে ছিল না, তাও তার মধ্যে যে জোড়াটা সবচেয়ে ছোট সেটা পরে তিনি প্রায় আঁতকে উঠলেন।

'এ যে গণ্ডারের চামড়া মশাই ! এ তো গণ্ডার ছাড়া আর কারুর পায়ে সুট করবে না !'

'তাহলে ধরে নিন রাজস্থানের শতকরা নব্বই ভাগ লোক আসলে গণ্ডার।'

দু'জনেই নাগরা খুলে যে যার জুতো পরে নিল। দোকানদারও হাসছিল। সে বুঝেছে শহরের বাবুরা ছোটলোকদের জুতো পায়ে দিয়ে একটু রসিকতা করছে।

আমরা এগিয়ে চললাম। একটা পানের দোকান থেকে বেদম জোরে রেডিওতে ফিল্মের গানের আওয়াজ বেরোচ্ছে। মনে পড়ে গেল কলকাতার পুজো প্যান্ডেলের কথা। এখানে পুজো নেই, আছে দসেরা। কিন্তু তার এখনো অনেক দেরী।

আরো কিছু দূর এগিয়ে ফেলুদা একটা পাথরের তৈরি জিনিসের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে গেল। দোকানটার চেহারা বেশ ভদ্র, নাম সোলাঙ্কি স্টোর্স। বাইরে কাঁচের জানালার পিছনে সুন্দর সুন্দর পাথরের ঘটি বাটি গেলাস পাত্র সাজানো রয়েছে। ফেলুদা একদৃষ্টে সেগুলোর দিকে চেয়ে আছে। দোকানদার দরজার মুখটাতে এগিয়ে এসে আমাদের ভিতরে আসতে অনুরোধ করল।

ফেলুদা জানালার দিকে দেখিয়ে বলল, 'ওই বাটিটা একবার দেখতে পারি ?'

দোকানদার জানালার বাটিটা না বার করে ভিতরের একটা আলমারি থেকে ঠিক সেই রকমই একটা বাটি বার করে দিল। সুন্দর হলদে রঙের পাথরের বাটি। আগে কখনো এরকম জিনিস দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

'এটা কি এখানকার তৈরি ?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

দোকানদার বলল, 'রাজস্থানেরই জিনিস, তবে যোধপুরের নয়।'

'তবে কোথাকার ?'

'জয়সলমীর। এই হলদে পাথর শুধু ওখানেই পাওয়া যায়।'

'আই সী...'

জয়সলমীর নামটা আমি আবছা আবছা শুনেছি। জায়গাটা যে রাজস্থানের ঠিক কোনখানে সেটা আমার জানা ছিল না। ফেলুদা বাটিটা কিনে নিল। সাড়ে নটা নাগাদ টাঙ্গার ঝাঁকুনি খেয়ে সকালের ডিম-রুটি হজম করে আমরা সার্কিট হাউসে ফিরলাম।

মন্দার বোস বারান্দায় বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। আমাদের হাতে প্যাকেট দেখে বললেন, 'কী কিনলেন ?'

ফেলুদা বলল, 'একটা বাটি। রাজস্থানের একটা মেমেন্টো রাখতে হবে তো।'

'আপনার বন্ধু তো বেরোলেন দেখলাম।'

'কে, ডক্টর হাজরা ?'

'নটা নাগাদ বেরিয়ে যেতে দেখলাম একটা ট্যাক্সি করে।'





'আর মুকুল ?'

'সঙ্গেই গেছে। বোধ হয় পুলিশে রিপোর্ট করতে গেছেন। কালকের ঘটনার পর হি মাস্ট বি কোয়াইট শেক্‌ন।'

লালমোহনবাবু 'প্লটটা একটু চেঞ্জ করতে হবে' বলে তাঁর ঘরে চলে গেলেন।

ঘরে গিয়ে ফেলুদাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'হঠাৎ বাটিটা কিনলে কেন ফেলুদা !'

ফেলুদা সোফায় বসে বাটিটা মোড়ক থেকে খুলে টেবিলের উপর রেখে বলল, 'এটার একটা বিশেষত্ব আছে।'

'কী বিশেষত্ব ?'

'জীবনে এই প্রথম একটা বাটি দেখলাম যেটাকে সোনার পাথরবাটি বললে খুব ভুল বলা হয় না।'

এর পরে আর কোনো কথা না বলে সে ব্র্যাড্‌শর পাতা উল্টোতে আরম্ভ করল। আমি আর কী করি। জানি এখন ঘণ্টাখানেক ফেলুদার মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরোবে না, বা তাকে কিছু জিজ্ঞেস করলে তার উত্তর পাওয়া যাবে না, তাই অগত্যা বাইরে বেরোলাম।

লম্বা বারান্দাটা এখন খালি। মন্দারবাবু উঠে গেছেন। দূরে একজন মেমসাহেব বসেছিলেন, তিনিও উঠে গেছেন। একটা ঢোলকের আওয়াজ ভেসে আসছে। এবার তার সঙ্গে একটা গান শুরু হল। গেটের দিকে চেয়ে দেখলাম, দুটো ভিখিরি গোছের লোক—একটা পুরুষ আর একটা মেয়ে—গেট দিয়ে ঢুকে আমাদের বারান্দার দিকে এগিয়ে আসছে। ছেলেটা ঢোলক বাজাচ্ছে আর মেয়েটা গান গাইছে। আমি বারান্দা দিয়ে এগিয়ে গেলাম।

মাঝখানের খোলা জায়গাটায় গিয়ে ইচ্ছে হল একবার দোতলায় যাই। সিঁড়িটা প্রথম দিন থেকেই দেখছি, আর জানি যে উপরে ছাত আছে। উঠে গেলাম সিঁড়ি দিয়ে।

দোতলার মাঝখানে পাশাপাশি খানচারেক ঘর। সেগুলোর দু-দিকে পুবে আর পশ্চিমে খোলা ছাত। ঘরগুলোতে লোকজন নেই বলেই মনে হল। কিংবা হয়ত যারা আছে তারা বেরিয়েছে।

পশ্চিম দিকের ছাতটায় গিয়ে দেখি যোধপুরের কেল্লাটা দারুণ দেখাচ্ছে সেখান থেকে।

নিচে ভিখিরির গান হয়ে চলেছে। সুরটা চেনা চেনা লাগছে। কোথায় শুনেছি এ সুর ? হঠাৎ বুঝতে পারলাম, মুকুল যে সুরে গুনগুন করে,তার সঙ্গে এর খুব মিল আছে। বার বার একই সুর ঘুরে ঘুরে আসছে, কিন্তু শুনতে একঘেয়ে লাগছে না। আমি ছাতের নিচু পাঁচিলটার দিকে এগিয়ে গেলাম। এদিকটা হচ্ছে সার্কিট হাউসের পিছন দিক।

ওমা, পিছনেও যে বাগান আছে তা তো জানতাম না ! আমাদের ঘরের পিছন দিকে জানালা দিয়ে একটা ঝাউ গাছ দেখা যায় বটে, কিন্তু এতখানি জায়গা জুড়ে এত রকম গাছ আছে এদিকটায় সেটা বুঝতে পারিনি।

ঝলমলে নীল ওটা কী নড়ছে গাছপালার পিছনে ? ওহো—একটা ময়ূর। গাছের পিছনে লুকোনো ছিল শরীরের খানিকটা, তাই বুঝতে পারিনি। এবারে পুরো শরীরটা দেখা যাচ্ছে। মাটি থেকে খুঁটে খুঁটে কী যেন খাচ্ছে। পোকাটোকা বোধ হয় ; ময়ূর তো পোকা খায় বলেই জানি। হঠাৎ মনে পড়ল কোথায় যেন পড়েছিলাম যে, ময়ূরের বাসা খুঁজে পাওয়া খুব মুশকিল। তারা বেছে বেছে নাকি অদ্ভুত সব গোপন জায়গা বার করে বাসা তৈরি করে।

আস্তে আস্তে পা ফেলে ময়ূরটা এগোচ্ছে, লম্বা গলাটাকে বেঁকিয়ে এদিক ওদিক ঘুরে দেখছে, শরীরটা ঘুরলে সমস্ত লেজটা সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে যাচ্ছে।

হঠাৎ ময়ূরটা দাঁড়াল। গলাটা ডান দিকে ঘোরালো। কী দেখছে ময়ূরটা ? নাকি কোনো শব্দ শুনেছে ?

ময়ূরটা সরে গেল। কী জানি দেখে ময়ূরটা সরে যাচ্ছে।

একজন লোক। আমি যেখানে দাঁড়িয়েছি তার ঠিক নিচে। গাছের ফাঁক দিয়ে ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে। লোকটার মাথায় পাগড়ি। খুব বেশি বড় না—মাঝারি। গায়ে সাদা চাদর জড়ানো। একেবারে ওপর থেকে দেখছি বলে লোকটার মুখ দেখা যাচ্ছে না। খালি পাগড়ি আর কাঁধ। হাত দুটো চাদরের তলায়।

লোকটা পা টিপে টিপে এগোচ্ছে। পশ্চিম দিক থেকে পুব দিকে। আমি রয়েছি পশ্চিমের ছাতে। পুব দিকে একতলায় আমাদের ঘর।

হঠাৎ ইচ্ছে করল লোকটা কোথায় যায় দেখি।

মাঝের ঘরগুলো দৌড়ে পেরিয়ে গিয়ে উল্টো দিকের ছাতের পিছনের পাঁচিলের কাছে গিয়ে সামনে ঝুঁকে পড়লাম।

লোকটা এখন আবার আমার ঠিক নিচে। ছাতের দিকে চাইলে আমাকে দেখতে পাবে, কিন্তু দেখল না।

এগিয়ে আসছে সামনের দিকে লোকটা। আমাদের ঘরের জানালার দিকে এগিয়ে আসছে। হাতটা চাদরের ভিতর থেকে বার করল। কবজির কাছটায় চকচকে ওটা কী ?

লোকটা থেমেছে। আমার গলা শুকিয়ে গেছে। লোকটা আরেক পা এগোল—

'ক্যাঁ ও য়্যাঁ !'

লোকটা চমকে পিছিয়ে গেল। ময়ূরটা কর্কশ স্বরে ডেকে উঠেছে। আর সেই সঙ্গে সঙ্গেই আমিও চেঁচিয়ে উঠলাম—





'ফেলুদা !'

পাগড়ি পরা লোকটা ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে যেদিক দিয়ে এসেছিল সেদিকে অদৃশ্য হয়ে গেল, আর আমিও দুড়দাড় করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে বারান্দা দিয়ে এক নিশ্বাসে দৌড়ে গিয়ে আমাদের ঘরে দরজার মুখে ফেলুদার সঙ্গে দড়াম করে কলিশন খেয়ে ভ্যাবাচ্যাকা চুপ !

আমাকে ঘরে টেনে নিয়ে গিয়ে ফেলুদা বলল, 'কী ব্যাপার বল তো ?'

'ছাত থেকে দেখলাম, একটা লোক...পাগড়ি পরে...তোমার জানালার দিকে আসছে...'

'দেখতে কীরকম ? লম্বা ?'

'জানি না...উপর থেকে দেখছিলাম তো !...হাতে একটা...'

'হাতে কী ?'

'ঘড়ি...'

আমি ভেবেছিলাম ফেলুদা ব্যাপারটা হেসে উড়িয়ে দেবে কিংবা আমাকে বোকা আর ভীতু বলে ঠাট্টা করবে। কিন্তু তার কোনোটাই না করে ও গম্ভীরভাবে জানালাটার দিকে গিয়ে বাইরে মুখ বাড়িয়ে এদিক ওদিক দেখে নিল।

দরজায় একটা টোকা পড়ল।

'কাম ইন।'

বেয়ারা কফি নিয়ে ঢুকল।

'সেলাম সা'ব !'

টেবিলের উপর কফির ট্রেটা রেখে পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা চিঠি বার করে ফেলুদাকে দিল।

'মৈনেজার সা'বনে দিয়া।'

বেয়ারা চলে গেল। ফেলুদা চিঠিটা পড়ে একটা হতাশার ভাব করে ধপ করে সোফার উপর বসে পড়ল।

'কার চিঠি ফেলুদা ?'

'পড়ে দ্যাখ্।'

ডক্টর হাজরার চিঠি। ডক্টর হাজরার নাম লেখা প্যাডের কাগজে ইংরিজিতে লেখা ছোট্ট চার লাইনের চিঠি—'আমার বিশ্বাস আমাদের পক্ষে আর যোধপুরে থাকা নিরাপদ নয়। আমি অন্য আরেকটা জায়গায় চললাম, সেখানে কিছুটা সাফল্যের আশা আছে মনে হয়। আপনি আর আপনার ভাইটি কেন আর মিথ্যা বিপদের মধ্যে জড়াবেন ; তাই আপনাদের কাছে বিদায় না নিয়েই চললাম। আপনাদের মঙ্গল কামনা করি।—ইতি এইচ এম হাজরা।'

ফেলুদা দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'অত্যন্ত হেস্টি কাজ করেছেন ভদ্রলোক।'

তারপর কফি না খেয়েই সোজা চলে গেল রিসেপশন কাউন্টারে। আজ একটি নতুন ভদ্রলোক বসে আছেন সেখানে। ফেলুদা জিজ্ঞেস করল, 'ডক্টর হাজরা কি ফিরবেন বলে গেছেন ?'

'না তো। উনি ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে গেছেন। ফেরার কথা তো কিছু বলেননি।'

'কোথায় গেছেন সেটা আপনি জানেন ?'

'স্টেশনে গেছেন এটাই শুধু জানি।'

ফেলুদা একটুক্ষণ ভেবে বলল, 'জয়সলমীর তো এখান থেকে ট্রেনে যাওয়া যায়, তাই না ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। বছর দুয়েক হল ডিরেক্ট লাইন হয়েছে।'

'কখন ট্রেন ?'

'রাত দশটা।'

'সকালের দিকে কোনো ট্রেন নেই ?'

'যেটা আছে সেটা অর্ধেক পথ যায়, পোকরান পর্যন্ত। সেটা এই আধ ঘণ্টা হল ছেড়ে গেছে। পোকরান থেকে যদি গাড়ির ব্যবস্থা থাকে তা হলে অবিশ্যি এ ট্রেনটাতেও জয়সলমীর যাওয়া যায়।'

'কতটা রাস্তা পোকরান থেকে ?'

'সত্তর মাইল।'

'সকালে যোধপুর থেকে অন্য কী ট্রেন আছে ?'

ভদ্রলোক একটা বইয়ের পাতা উল্টেপাল্টে দেখে বললেন, 'আটটায় একটা প্যাসেঞ্জার আছে, সেটা বারমের যায়। নটায় আছে রেওয়ারি প্যাসেঞ্জার। দ্যাটস্ অল।'

ফেলুদা কাউন্টারের উপর ডান হাতের আঙুলের ডগা দিয়ে কয়েকবার অসহিষ্ণুভাবে টোকা দিয়ে বলল, 'জয়সলমীর তো এখান থেকে প্রায় দু'শো মাইল, তাই না ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আপনি অনুগ্রহ করে একটা ট্যাক্সির বন্দোবস্ত করে দেবেন ? আমরা সাড়ে এগারোটা নাগাদ বেরোতে চাই।'

ভদ্রলোক সম্মতি জানিয়ে টেলিফোন তুললেন।

'কোথায় চললেন আপনারা ?'

মন্দার বোস। স্নানটান করে ফিটফাট হয়ে হাতে সুটকেস নিয়ে বেরিয়েছেন ঘর থেকে।

ফেলুদা বলল, 'একটু থর মরুভূমিটা দেখার ইচ্ছে আছে।'

'ও, তার মানে নর্থ-ওয়েস্ট। আমি যাচ্ছি একটু ইস্টে।'





'আপনিও চললেন ?'

'মাই ট্যাক্সি শুড বি হিয়ার এনি মিনিট নাউ। বেশি দিন এক জায়গায় মন টেকে না মশাই। আর আপনারাও যদি চলে যান তা হলে তো সার্কিট হাউস খালি হয়ে যাচ্ছে এমনিতেও।'

কাউন্টারের ভদ্রলোক কথা শেষ করে টেলিফোনটা নামিয়ে রেখে বললেন, 'ইট্স অ্যারেঞ্জড্।'

ফেলুদা একবার আমাকে বলল, 'দ্যাখ তো লালমোহনবাবুর দেখা পাস কিনা। বল যে, আমরা এগারোটায় জয়সলমীর যাচ্ছি। যদি উনি আসতে চান আমাদের সঙ্গে, তাহলে যেন ইমিডিয়েটলি তৈরি হয়ে নেন।'

আমি ছুটলাম দশ নম্বর ঘরের দিকে। কী উদ্দেশ্যে যে জয়সলমীর যাচ্ছি জানি না। ফেলুদা অন্য সব জায়গা ফেলে এ জায়গাটা বাছল কেন ? বোধ হয় মরুভূমির কাছে বলে। ডক্টর হাজরাও কি জয়সলমীর গেছেন ? এই কি আমাদের বিপদের শেষ ? না এই সবে শুরু ?

## ॥ ৮ ॥

যোধপুর থেকে পোকরান প্রায় একশো কুড়ি মাইল রাস্তা। সেখান থেকে জয়সলমীর আবার সত্তর মাইল। সবসুদ্ধ এই দুশো মাইল যেতে আন্দাজ সাড়ে ছয় সাত ঘণ্টা লাগা উচিত। অন্তত আমাদের ড্রাইভার গুরুবচন সিং তাই বলল। বেশ গোলগাল হাসিখুশি শিখ ড্রাইভারটিকে লক্ষ করছিলাম মাঝে মাঝে স্টিয়ারিং থেকে হাত দুটো সরিয়ে নিয়ে মাথার পিছনে দিয়ে শরীরটা পিছন দিকে হেলিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে। গাড়ি অবিশ্যি তখনো চলছে, আর স্টিয়ারিং ঘোরানোর কাজটা সেরে নিচ্ছে ভুঁড়িটাকে এগিয়ে দিয়ে। কাজটা অবিশ্যি শুনতে যত কঠিন মনে হয় ততটা নয়, কারণ প্রথমত গাড়ি চলাচল এ রাস্তায় প্রায় নেই বললেই চলে, আর দ্বিতীয়ত পাঁচ ছ' মাইল ধরে একটানা সোজা রাস্তা এর মধ্যে অনেকবারই লক্ষ করলাম। পথে কোনো গোলমাল না হলে মনে হয় সন্ধ্যা ছ'টা নাগাদ জয়সলমীর পৌঁছে যাব।

যোধপুর ছাড়িয়ে মাইল দশেক পর থেকেই এমন সব দৃশ্য আরম্ভ হয়েছে যেমন আমি এর আগে কখনো দেখিনি। যোধপুরের আশেপাশে অনেক পাহাড় আছে, যে সব পাহাড়ের লালচে রঙের পাথর দিয়েই যোধপুরের কেল্লা তৈরি। কিন্তু কিছুক্ষণ থেকেই মনে হচ্ছে যেন পাহাড় ফুরিয়ে গেছে। তার বদলে আরম্ভ হয়েছে দিগন্ত অবধি গড়িয়ে যাওয়া ঢেউ খেলানো জমি। এই জমির কিছুটা ঘাস, কিছুটা লালচে মাটি, কিছুটা বালি আর কিছুটা কাঁকর। সাধারণ গাছপালাও ক্রমশ

কমে গিয়ে তার বদলে চোখে পড়ছে বাব্‌লা গাছ, আর নাম-না-জানা সব কাঁটা গাছ আর কাঁটা ঝোপ।

আর দেখছি বুনো উট। গরু ছাগলের মতো উট চরে বেড়াচ্ছে যেখানে সেখানে। তার কোনোটার রং দুধ দেওয়া চায়ের মতো, আর কোনোটা আবার ব্ল্যাক কফির কাছাকাছি। একটা উটকে দেখলাম ওই শুকনো কাঁটা গাছই চিবিয়ে খাচ্ছে। ফেলুদা বলল, কাঁটা গাছ খেয়ে নাকি অনেক সময় ওদের মুখের ভিতরটা ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়। কিন্তু এ সব অঞ্চলে এটাই ওদের খাদ্য বলে ওরা নাকি সেটা গ্রাহ্যই করে না।

জয়সলমীরের কথাও ফেলুদা বলছিল। দ্বাদশ শতাব্দীতে তৈরি এই শহর নাকি ভাটি রাজপুতদের রাজধানী ছিল। ওখান থেকে মাত্র চৌষট্টি মাইল দূরে পাকিস্তানের বর্ডার। দশ বছর আগেও নাকি জয়সলমীরে যাওয়া খুব মুশকিল ছিল। ট্রেন তো ছিলই না, রাস্তাও যা ছিল তা অনেক সময়ই বালিতে ঢাকা পড়ে হারিয়ে যেত। জায়গাটা নাকি এত শুকনো যে ওখানে বছরে একদিন বৃষ্টি হলেও লোকেরা সেটাকে সৌভাগ্য বলে মনে করে। যুদ্ধের কথা জিজ্ঞেস করতে ফেলুদা বলল যে আলাউদ্দীন খিলজি নাকি একবার জয়সলমীর আক্রমণ করেছিল।

নব্বুই কিলোমিটার বা ছাপ্পান্ন মাইলের কাছাকাছি এসে হঠাৎ আমাদের ট্যাক্সির একটি টায়ার পাংচার হয়ে গাড়িটা একটা বিশ্রী শব্দ করে রাস্তার একপাশে কেদ্‌রে থেমে গেল। গুরুবচন সিং-এর উপর মনে মনে বেশ রাগ হল। ও বলেছিল টায়ার চেক করে নিয়েছে, হাওয়া দেখে নিয়েছে ইত্যাদি। সত্যি বলতে কী, গাড়িটা বেশ নতুনই।

সর্দারজীর সঙ্গে সঙ্গে আমরাও বাইরে বেরোলাম। টায়ার চেঞ্জ করার হ্যাঙ্গাম আছে, অন্তত পনেরো মিনিটের ধাক্কা।

চ্যাপটা টায়ারের দিকে চোখ যাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমরা পাংচারের কারণটা বুঝতে পারলাম।

রাস্তার অনেকখানি জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে আছে অজস্র পেরেক। সেগুলো দেখেই বোঝা যায় যে সদ্য কেনা হয়েছে।

আমরা এ-ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম। সিং সাহেব দাঁতের ফাঁক দিয়ে একটা কথা বলল, যেটা অবিশ্যি বইয়ে লেখা যায় না। ফেলুদা কিছুই বলল না, শুধু কোমরে হাত দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে ভাবতে লাগল। লালমোহনবাবু একটা পুরোন জাপান এয়ার লাইনসের ব্যাগ থেকে একটা ডায়রি ধরনের সবুজ খাতা বার করে তাতে খস খস করে পেনসিল দিয়ে কী জানি লিখলেন।





নতুন টায়ার পরিয়ে, ফেলুদার কথামতো রাস্তা থেকে পেরেক সরিয়ে, যখন আবার রওনা হচ্ছি তখন ঘড়িতে পৌনে দুটো। ফেলুদা ড্রাইভারকে বলল—'একটু রাস্তার দিকে নজর রেখে চালাবেন সর্দারজী—আমাদের পেছনে যে দুশমন লেগেছে সে তো বুঝতেই পারছেন।'

এদিকে বেশি আস্তে গেলে পৌঁছতে রাত হয়ে যাবে, কাজেই গুরুবচন সিং ষাট থেকে নামিয়ে চল্লিশে রাখলেন স্পীডোমিটার। সত্যি বলতে কী, রাস্তার উপর চোখ রাখতে গেলে ঘণ্টায় দশ-পনেরো মাইলের বেশি স্পীড তোলা চলে না।

প্রায় একশো ষাট কিলোমিটার অর্থাৎ একশো মাইলের কাছাকাছি এসে সর্বনাশটা আর এড়ানো গেল না।

এবার কিন্তু পেরেক না, এবার পিতলের বোর্ড পিন। আন্দাজে মনে হয় প্রায় হাজার দশেক পিন বিশ-পঁচিশ হাত জায়গা জুড়ে ছড়ানো রয়েছে। বুঝতেই পারলাম যে, টায়ার ফাঁসানেওয়ালারা কোনো রিস্ক নিতে চাননি।

আর এটাও জানি, গুরুবচন সিং-এর ক্যারিয়ারে আর স্পেয়ার নেই।

চারজনই আবার গাড়ি থেকে নামলাম। সিং সাহেবের ভাব দেখে মনে হল, মাথায় পাগড়ি না থাকলে তিনি নিশ্চয়ই মাথা চুলকোতেন।

ফেলুদা জিজ্ঞেস করল, 'পোকরান টাউন হ্যায় ইয়া গাঁও হ্যায় ?'

'টাউন হ্যায় বাবু।'

'কিৎনি দূর ইঁহাসে ?'

'পঁচিশ মিল হোগা।'

'সর্বনাশ !...তব্ আভি হোগা কেয়া ?'

গুরুবচন সিং বুঝিয়ে দিল যে, এ লাইনে যে ট্যাক্সিই যাক না কেন, সেটা তার চেনা হবেই। এখানে অপেক্ষা করে যদি সে রকম ট্যাক্সি একটা ধরা যায়, ত' হলে তাদের কাছ থেকে স্পেয়ার চেয়ে নিয়ে তারপর পোকরানে গিয়ে পাংচার সারিয়ে নেওয়া যাবে। কিন্তু কথা হচ্ছে, সে রকম ট্যাক্সি যাবে কি না, আর গেলেও, সেটা কখন যাবে ! কতক্ষণ আমাদের এই ধূ-ধূ প্রান্তরের মধ্যে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে !

পাঁচটা উট আর তার সঙ্গে তিনটি লোকের একটা দল আমাদের পাশ দিয়ে যোধপুরের দিকে চলে গেল। লোকগুলোর প্রত্যেকটার রং একেবারে মিশকালো। তার মধ্যে আবার একজনের ধবধবে সাদা দাড়ি আর গালপাট্টা। তারা আমাদের দিকে দেখতে দেখতে চলেছে দেখেই বোধহয় লালমোহনবাবু একটু ফেলুদার দিক ঘেঁষে দাঁড়ালেন।

'সব্‌সে নজ্‌দিক কোন্ রেল স্টেশন হ্যায় ?' ফেলুদা বোর্ড পিন তুলতে তুলতে জিজ্ঞেস করল। আমরাও অন্য গাড়ির কথা ভেবে এই সৎকার্যটায় হাত

লাগিয়েছিলাম।

'সাত আট মিল হোগা রামদেওরা।'

'রামদেওরা...'

রাস্তা থেকে বোর্ড পিন সরানো হলে পর, ফেলুদা তার ঝোলা থেকে ব্র্যাড্‌শ টাইম টেবল বার করল। একটা বিশেষ পাতা ভাঁজ করা ছিল, সেখানটা খুলে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, 'লাভ নেই। তিনটে পঁয়তাল্লিশে যোধপুর থেকে সকালের ট্রেনটা রামদেওরা পৌঁছনোর কথা। অর্থাৎ সে গাড়ি নিশ্চয়ই এতক্ষণে আমাদের ছাড়িয়ে চলে গেছে।'

আমি বললাম, 'কিন্তু রাত্রের দিকে আরেকটা ট্রেন যায় না জয়সলমীর?'

'হুঁ। কিন্তু সেটা রামদেওরা পৌঁছবে ভোর রাত্তিরে—তিনটে তিপ্পান্ন। এখান থেকে এখন হাঁটা দিলে রামদেওরা পৌঁছতে ঝাড়া দু'ঘণ্টা। সকালের ট্রেনটা ধরার যদি আশা থাকত, তা হলে হেঁটে যাওয়াতে একটা লাভ ছিল। অন্তত পোকরানটা

পৌঁছানো যেত। এই মাঠের মাঝখানে...'

লালমোহনবাবু এই অবস্থার মধ্যেও হেসে একটু কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, 'যাই বলুন মশাই, এ সব সিচুয়েশন কিন্তু উপন্যাসেই পাওয়া যায়। রিয়েল লাইফেও যে এরকমটা—'

ফেলুদা হঠাৎ হাত বাড়িয়ে ভদ্রলোককে থামতে বললেন। চারিদিকে একটাও শব্দ নেই, সারা পৃথিবী যেন এখানে এসে বোবা হয়ে গেছে। এই নিস্তব্ধতার মধ্যে স্পষ্ট শুনতে পেলাম একটা ক্ষীণ আওয়াজ—ঝুক্‌-ঝুক্‌ ঝুক্‌-ঝুক্‌ ঝুক্‌-ঝুক্‌ ঝুক্‌-ঝুক্‌...





ট্রেন আসছে। পোকরানের ট্রেন। কিন্তু লাইন কোথায়?

শব্দের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে হঠাৎ দূরে চোখে পড়ল ধোঁয়া। আর তার সঙ্গে সঙ্গেই দেখতে পেলাম টেলিগ্রাফের পোল। জমিটা ঢালু হয়ে গেছে তাই বোঝাই যায় না। পিছনের লাল মাটির সঙ্গে লাল টেলিগ্রাফ পোল মিশে প্রায় অদৃশ্য হয়ে আছে। আকাশে মাথা উঁচিয়ে থাকলে আগেই চোখে পড়ত।

'দৌড়ো!'

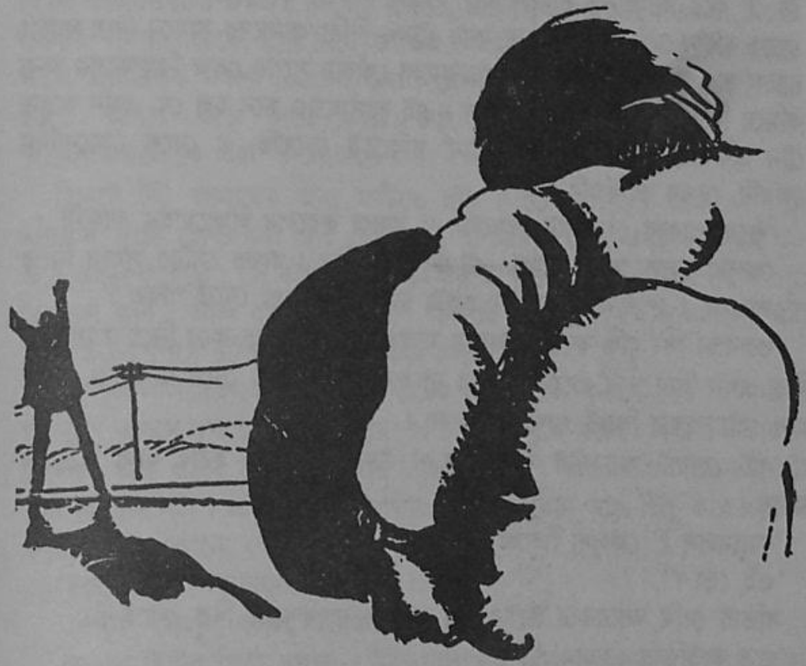

ফেলুদা চীৎকারটা দিয়েই ধোঁয়া লক্ষ্য করে ছুট দিল। সঙ্গে সঙ্গে আমিও। আর আমার পিছনে জটায়ু। আশ্চর্য! ভদ্রলোক ওই লিক্‌পিকে শরীর নিয়ে এমন ছুটতে পারেন, তা আমি ভাবতে পারিনি। আমাকে ছাড়িয়ে প্রায় ফেলুদাকে ধরে ফেলেন আর কী!

পায়ের তলায় ঘাস, কিন্তু সে ঘাসের রং সবুজ নয়—একেবারে তুলোর মতো সাদা। তার উপর দিয়ে পড়ি-কি-মরি ছুট দিয়ে আমরা ঢালুর নিচে লাইনের ধারে পৌঁছে দেখি, ট্রেনটা আমাদের একশো গজের মধ্যে এসে পড়েছে।

ফেলুদা এক মুহূর্ত ইতস্তত না করে এক লাফে একেবারে লাইনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ে দুটো হাত মাথার উপর তুলে হৈ-হৈ করে নাড়তে আরম্ভ করে দিল। ট্রেন এদিকে হুইসল্ দিতে আরম্ভ করেছে, আর সেই হুইসল্ ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছে জটায়ুর চীৎকার—'রোক্কে, রোক্কে, হল্ট, হল্ট, রোক্কে !...'

কিন্তু কে কার কথা শোনে। এ ট্রেন যদিও ছোট, কিন্তু মার্টিন কোম্পানির ট্রেনের মতো নয় যে, মাঝ-রাস্তায় দাঁড়িয়ে হাত দেখালে বাসের মতো থেমে যাবে। প্রচণ্ড হুইসল্ মারতে মারতে স্পীড বিন্দুমাত্র না কমিয়ে ট্রেনটা একেবারে হৈ হৈ করে আমাদের সামনে এসে পড়ল। ফলে ফেলুদাকে বাধ্য হয়ে লাইন থেকে বাইরে চলে আসতে হল, আর ট্রেনও দিব্যি আমাদের সামনে দিয়ে ঘ্যাচাং ঘ্যাচাং শব্দ করতে করতে কুচকুচে কালো ধোঁয়ায় সূর্যের তেজ কিছুক্ষণের জন্য কমিয়ে দিয়ে দূরে অদৃশ্য হয়ে গেল। এই দুঃসময়েও মনে হল যে, এমন অদ্ভুত ট্রেন একমাত্র হলিউডের 'ওয়েস্টার্ন' ছবিতেই দেখেছি, এ দেশে কোনোদিন দেখিনি, দেখব ভাবিওনি।

'শুঁয়োপোকার রোয়াবটা দেখলেন ?' মন্তব্য করলেন লালমোহন গাঙ্গুলী।

ফেলুদা বলল, 'ব্যাড লাক্। ট্রেনটা লেট ছিল। অথচ সেটার সুযাগ নিতে পারলাম না। পোকরানে হয়তো একটা ট্যাক্সিও পাওয়া যেতে পারত।'

গুরুবচন সিং বুদ্ধি করে আমাদের মালগুলো সব হাতে করে নিয়ে আসছিল, কিন্তু এখন আর তার প্রয়োজন হবে না। লাইনের দিকে চেয়ে দেখলাম, এখন আর ধোঁয়া ছাড়া কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

'বাট হোয়াট অ্যাবাউট ক্যামেলস্ ?' উত্তেজিত স্বরে হঠাৎ বলে উঠলেন জটায়ু।

'ক্যামেলস্ ?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

'ওই তো !'

সত্যিই দেখি, আরেকটা উটের দল আসছে যোধপুরের দিক থেকে।

'গুড আইডিয়া। চলুন !'

ফেলুদার কথায় আবার দৌড়।

'সে রকম খেপে উঠলে নাকি উট টোয়েন্টি মাইলস্ পার আওয়ার ছুটতে পারে'—ছুটতে ছুটতেই বললেন লালমোহনবাবু।

উটের দলকে থামানো হল। এবারে দু'জন লোক আর সাতখানা উট। ফেলুদা প্রস্তাব করল—রামদেওরা যাব, তিনটে উট কত লাগবে বলো। এদের ভাষা আবার হিন্দি নয়; স্থানীয় কোনো একটা ভাষায় কথা বলে। তবে হিন্দি বোঝে, আর ভাঙা ভাঙা বলতেও পারে। গুরুবচন সিং এসে আমাদের হয়ে কিছুটা কথাবার্তা বলে দিল। দশ টাকায় রাজী হয়ে গেল উট ভাড়া দিতে।





'দৌড়ানে সেকেগা আপকা উট ?' লালমোহনবাবু জিজ্ঞেস করলেন। 'ট্রেন ধরনে হোগা।'

ফেলুদা হেসে বলল, 'আগে তো উঠুন। দৌড়ের কথা পরে।'

'উঠব ?'

এই প্রথম বোধহয় লালমোহনবাবু উটের সামনে পড়ে তার পিঠে ওঠার ব্যাপারটা তলিয়ে দেখলেন। আমি জানোয়ারগুলোকে ভালো করে দেখছিলাম। কী বিদঘুটে চেহারা, কিন্তু কী বাহারের সাজ পরিয়েছে তাদের। হাতির পিঠে যেমন ঝালরওয়ালা জাজিম দেখেছি ছবিতে, এদের পিঠেও তাই। একটা কাঠের বসবার ব্যবস্থা রয়েছে, তার নিচে জাজিম। জাজিমে আবার লাল নীল হলদে সবুজ জ্যামিতিক নকশা। উটের গলাও দেখলাম লাল চাদর দিয়ে ঢাকা, আর তাতে আবার কড়ি দিয়ে কাজ করা। বুঝলাম, যতই কুশ্রী হোক, জানোয়ারগুলোকে এরা ভালোবাসে।

তিনটে উট আমাদের জন্য মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসেছে। আমাদের দুটো সুটকেস্, দুটো হোল্ড-অল আর ছোটখাটো যা জিনিস ছিল, সবই গুরুবচন সিং এনে জড়ো করেছে। সে বলে দিল, ট্রেন ধরতে পারলে আমরা যেন পোকরানে অপেক্ষা করি; আজ রাত্রের মধ্যে সে অবশ্যই পৌঁছে যাবে। মালগুলো অন্য দুটো উটের পিঠে চাপিয়ে বেঁধে দেওয়া হল।

ফেলুদা লালমোহনবাবুকে বলল, 'উটের বসাটা লক্ষ করলেন তো ? সামনের পা দুটো প্রথমে দুমড়ে শরীরের সামনের দিকটা আগে মাটিতে বসছে। তারপর পেছন। আর ওঠার সময় কিন্তু হবে ঠিক উল্টোটা। আগে উঠবে পিছন দিকটা, তারপর সামনেটা। এই হিসেবটা মাথায় রেখে শরীরটা আগু-পিছু করে নেবেন, তাহলে আর কোনো কেলেঙ্কারি হবে না।'

'কেলেঙ্কারি ?' জটায়ুর গলা কাঠ।

'দেখুন', ফেলুদা বলল, 'আমি আগে উঠছি।'

ফেলুদা উটের পিঠে চাপল। উটওয়ালাদের মধ্যে একজন মুখ দিয়ে একটা আওয়াজ করতেই ঠিক যেরকমভাবে ফেলুদা বলেছিল সেইভাবে উটটা তেড়ে বেঁকে ভীষণ একটা ল্যাগব্যাগে ভঙ্গীতে উঠে দাঁড়াল। এটা বুঝতে পারলাম যে, ফেলুদার বেলা কোনো কেলেঙ্কারি হল না।

'তোপ্‌সে ওঠ। তোরা হালকা মানুষ, তোদের ঝামেলা অনেক কম।'

উটওয়ালারা দেখি বাবুদের কাণ্ড দেখে দাঁত বার করে হাসছে। আমিও সাহস করে উঠে পড়লাম, আর সেই সঙ্গে উটটাও উঠে দাঁড়াল। বুঝলাম যে আসল গোলমালটা হচ্ছে এই যে, পিছনের পা-টা যখন খাড়া হয়, সওয়ারির শরীরটা তখন এক ঝটকায় সামনের দিকে অনেকখানি এগিয়ে যায়। মনে মনে ঠিক

করলাম যে, এর পরে যদি কখনো উঠি তাহলে প্রথম দিকে শরীরটাকে পিছনে হেলিয়ে টান করে রাখব, তাহলে ব্যালেন্সটা ঠিক হবে।

'জয় ম্যা—'

লালমোহনবাবুর মা-টা ম্যা হয়ে গেল এই কারণেই যে, তিনি কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই উটের পিছন দিকটা এক ঝটকায় উঁচু হয়ে গেল, যার ফলে তিনি খেলেন এক রামহুমড়ি। আর তারপরেই উল্টো হ্যাঁচকায় 'হেঁইক' করে এক বিকট শব্দ করেই ভদ্রলোক একেবারে পারপেন্ডিকুলার।

গুরুবচন সিং-এর কাছে বিদায় নিয়ে আমরা তিন বেদুইন রামদেওরা স্টেশনের উদ্দেশে যাত্রা করলাম।

'আধা ঘণ্টে মে আট মিল যানা হ্যায়, টিরেন পাকড়ানা হ্যায়', ফেলুদা উটওয়ালাদের উদ্দেশে করে হাঁক দিল। কথাটা শুনে একজন উটওয়ালা আরেকটা উটের পিঠে চড়ে খচ্‌মচ্‌ খচ্‌মচ্‌ করে সামনে এগিয়ে গেল। তারপর অন্য লোকটার মুখ দিয়ে হেঁই হেঁই করে কয়েকটা শব্দ বেরোতেই শুরু হল উটের দৌড়।

নড়বড়ে জানোয়ার, দৌড়ের সঙ্গে সঙ্গে শরীরটা ঝাঁকুনিও খায় রীতিমত কিন্তু তাও ব্যাপারটা আমার মোটেই খারাপ লাগছিল না। আর তা ছাড়া বালি আর সাদা ঝলসানো ঘাসের ওপর দিয়ে ছুটে চলেছি, জায়গাটাও রাজস্থান, সব মিলিয়ে বেশ একটা রোমাঞ্চই লাগছিল।

ফেলুদা আমার চেয়ে খানিকটা এগিয়ে গিয়েছিল। লালমোহনবাবু আমার পিছনে। ফেলুদা একবার ঘাড়টা পিছনে ফিরিয়ে হাঁক দিল—

'শিপ অফ দ্য ডেজার্ট কীরকম বুঝছেন মিস্টার গাঙ্গুলী?'

আমিও একবার মাথা ঘুরিয়ে দেখে নিলাম লালমোহনবাবুর অবস্থাটা। খুব শীত লাগলে লোকে যেমন মুখ করে—তলার ঠোঁট ফাঁক হয়ে দেখা যায় দাঁতে দাঁত লেগে রয়েছে, আর গলার শিরাগুলো সব বেরিয়ে আসে—লালমোহনবাবুর দেখি সেই রকম অবস্থা।

'কী মশাই?' ফেলুদা হাঁকল, 'কিছু বলছেন না যে?'

পিছন থেকে এবার পাঁচটা ইনস্টলমেন্টে পাঁচটা কথা বেরোল—'শিপ...অলরাইট...বাট...টকিং...ইম্‌পসিব্‌ল...'

কোনো রকমে হাসি চেপে সওয়ারির দিকে মন দিলাম। আমরা এখন রেল লাইনের ধার দিয়ে চলেছি। একবার মনে হল, দূরে যেন ট্রেনের ধোঁয়াটা দেখতে পেলাম, তারপর আবার সেটা মিলিয়ে গেল। সূর্য নেমে আসছে। দৃশ্যও বদলে আসছে। আবার আবছা পাহাড়ের লাইন দেখতে পাচ্ছি বহু দূরে। ডান দিকে একটা প্রকাণ্ড বালির স্তূপ পড়ল। দেখে বুঝলাম তার উপরে মানুষের পায়ের





ছাপ পড়েনি। সমস্ত বালির গায়ে ঢেউয়ের মতো লাইন।

উটগুলোর বোধহয় একটানা এত দৌড়নো অভ্যেস নেই, তাই মাঝে মাঝে তাদের স্পীড কমে যাচ্ছিল, তারপর পিছন থেকে হেঁই হেঁই শব্দে তারা আবার দৌড়তে শুরু করছিল।

সোয়া চারটে নাগাদ আমরা দূরে লাইনের ধারে চৌকো ঘরের মতো একটা কিছু দেখতে পেলাম। এটা স্টেশন ছাড়া আর কী হতে পারে?

আরো কাছে এলে পর বুঝলাম, আমাদের আন্দাজ ঠিকই। একটা সিগন্যালও দেখা যাচ্ছে। এটা একটা রেলওয়ে স্টেশন, এবং নিশ্চয়ই রামদেওরা স্টেশন।

আমাদের উটের দৌড় ঢিমে হয়ে এসেছে। কিন্তু আর হেঁই হেঁই করার প্রয়োজন হবে না, কারণ ট্রেন এসে চলে গেছে। কতক্ষণের জন্য ট্রেনটা ফসকে গেল জানি না, তবে ফসকে যে গেছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

তার মানে এখন থেকে রাত তিনটে পর্যন্ত আমাদের এই জনমানবশূন্য প্রান্তরে এক অজানা জায়গায় একটা নাম-কা-ওয়াস্তে রেল স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে বসে কাটাতে হবে।

## ॥ ৯ ॥

স্টেশন বলতে একটা প্ল্যাটফর্ম, আর একটা ছোট্ট কাজ চালাবার মতো টিকিট ঘর। আসলে স্টেশন তৈরির কাজ এখনো চলছে; কবে শেষ হবে তার কোনো ঠিক নেই। আমরা টিকিট ঘরের কাছেই একটা জায়গা বেছে নিয়ে সুটকেস আর হোল্ড-অল মাটিতে পেতে তার উপরে বসেছি। এখানে বসার একটা কারণ এই যে, কাছেই কাঠের পোস্টে একটা কেরোসিনের বাতি ঝুলছে, কাজেই অন্ধকার হলেও সেই আলোতে আমরা অন্তত পরস্পরের মুখটা দেখতে পাব।

স্টেশনের কাছে একটা ছোটখাটো গ্রাম জাতীয় ব্যাপার আছে। ফেলুদা একবার সেদিকটায় ঘুরে এসে জানিয়েছে যে, খাবারের দোকান বলে কিছুই নাকি সেখানে নেই। খাবার বলতে আমাদের এখন যা সম্বল দাঁড়িয়েছে, সেটা হচ্ছে ফ্লাস্কের মধ্যে সামান্য জল আর লালমোহনবাবুর কাছে এক টিন জিভেগজা। বুঝতে পারছি, আজ রাতটা এই গজা খেয়েই থাকতে হবে। মিনিট দশেক হল সূর্য ডুবেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই অন্ধকার ঘনিয়ে আসবে। গুরুবচন সিং আসবে বলে বিশেষ ভরসা হয় না, কারণ আমরা এই যে তিন ঘণ্টা হল এসেছি, তার মধ্যে একটি গাড়িও যায়নি রাস্তা দিয়ে—না যোধপুরের দিকে, না জয়সলমীরের দিকে। রাত তিনটে পর্যন্ত এই প্ল্যাটফর্মে বসে থাকা ছাড়া আর কোনো উপায় আছে বলে মনে হয় না।

ফেলুদা ওর সুটকেসটার উপর বসে রেলের লাইনের দিকে চেয়ে আছে একদৃষ্টে। ওকে এর মধ্যে বার দু-তিন দেখেছি বাঁ হাতের তেলোর চাপে ডান হাতের আঙুল মটকাতে। বেশ বুঝেছি ওর ভেতরে একটা চাপা উত্তেজনার ভাব রয়েছে, আর তাই ও কথাও বলছে না বেশি।

দালদার টিনটা খুলে একটা জিভেগজা বার করে তাতে একটা কামড় দিয়ে লালমোহনবাবু বললেন, 'কী থেকে কী হয়ে যায় মশাই। আগ্রা থেকে যদি এক কামরায় সীট না পড়ত, তা হলে কি আর এভাবে আমার হলিডের চেহারাটা পালটে যেতো ?'

'আপনার কি আপসোস হচ্ছে ?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

'বলেন কী মশাই !' ফেলুদার প্রশ্নটা ভদ্রলোক হেসেই উড়িয়ে দিলেন। 'তবে কী জানেন, ব্যাপারটা যদি আমার কাছে আরেকটু ক্লিয়ার হত, তা হলে মজাটা আরো জমত।'

'কোন্ ব্যাপারটা ?'

'কিছুই তো জানি না মশাই। খালি শাট্‌লককের মতো এদিকে থাপ্পড় খেয়ে ওদিকে যাচ্ছি, আর ওদিকে থাপ্পড় খেয়ে এদিকে আসছি। এমনকি আপনি যে আসলে কে—হিরো না ভিলেন—তাই তো বুঝতে পারছি না, হে হে।'

'কী হবে জেনে ?' ফেলুদা মুচকি হেসে বলল। 'আপনি যখন উপন্যাস লেখেন, সব জিনিস কি আগে থেকে বলে দেন ? এই রাজস্থানের অভিজ্ঞতাটাকেও একটা উপন্যাস বলে ধরে নিন না। গল্পের শেষে দেখবেন সব রহস্য পরিষ্কার হয়ে গেছে।'

'আমি আস্ত থাকব তো গল্পের শেষে ? জ্যান্ত থাকব তো ?'

'ঠেকায় পড়লে আপনি যে দৌড়িয়ে খরগোশকেও হার মানাতে পারেন সেটা তো চোখেই দেখলাম। এটা কি কম ভরসার কথা ?'

একটা লোক এসে কখন জানি কেরোসিনের বাতিটা জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে। সেই আলোয় দেখতে পেলাম স্থানীয় পোশাক পরা দুটো পাগড়িধারী লাঠি ঠক্ ঠক্ করতে করতে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। তারা এসে আমাদের ঠিক চার-পাঁচ হাত দূরে মাটিতে উবু হয়ে বসে নিজেদের মধ্যে দুর্বোধ্য ভাষায়



'বলেন কী ?' লালমোহনবাবু ফ্লাস্ক থেকে জল ঢেলে খেলেন।

'নিঃসন্দেহে।'

লালমোহনবাবু এবার দালদার টিনটা বন্ধ করতে গিয়ে ঢাকনাটা হাত থেকে ফসকে ফেলে একটা বিশ্রী খ্যানখেনে শব্দ করে নিজেই আরো বেশি নার্ভাস হয়ে পড়লেন।

লোকগুলোর গায়ের রং একেবারে সদ্য কালি দিয়ে বুরুশ করা নতুন জুতোর মতো চকচকে। দুটোর মধ্যে একটা লোক এবার একটা সিগারেট বার করে মুখে পুরল, তারপর পকেট থাবড়ে থুবড়ে একটা দেশলাইয়ের বাক্স বার করে সেটা খালি দেখে ট্রেনের লাইনের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিল। খচ করে একটা শব্দ শুনে ফেলুদার দিকে চেয়ে দেখি, সে তার লাইটারটা জ্বালিয়ে লোকটার দিকে এগিয়ে দিয়েছে। লোকটা প্রথমে একটু অবাক, তারপর মুখ বাড়িয়ে সিগারেটটা ধরিয়ে ফেলুদার কাছ থেকে লাইটারটা নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখে এখানে-সেখানে টিপে ফস করে সেটাকে জ্বালাল। লালমোহনবাবু কী জানি বলতে গেলেন, কিন্তু গলা দিয়ে পরিষ্কার আওয়াজ বেরোল না। লোকটা আরো তিনবার লাইটারটা জ্বালিয়ে-নিভিয়ে সেটা ফেলুদাকে ফেরত দিয়ে দিল। লালমোহনবাবু এবার ঢাকনা লাগানো টিনটা সুটকেসে ভরতে গিয়ে পুরো টিনটাই হাত থেকে ফেলে গতবারের চেয়ে আরো চারগুণ বেশি শব্দ করে বসলেন। ফেলুদা সেদিকে কোনো ভ্রূক্ষেপ না করে তার থলি থেকে নীল খাতাটা বার করে এই টিমটিমে আলোতেই সেটা উলটে-পালটে দেখতে লাগল।

হঠাৎ লক্ষ করলাম টিকিট ঘরের পিছনে কিছুটা দূরে একটা কাঁটা ঝোঁপের উপর কোত্থেকে জানি একটা আলো এসে পড়েছে।

আলোটা বাড়ছে। এবার একটা গাড়ির আওয়াজ পেলাম। জয়সলমীরের দিক থেকে আসছে গাড়িটা। যাক্ বাবা ! মনে হচ্ছে গুরুবচনের সমস্যার সমাধান হলেও হতে পারে।

গাড়িটা হুস্ করে নাকের সামনে দিয়ে যোধপুরের দিকে চলে গেল। ঘড়িতে দেখলাম সাড়ে সাতটা।

'ঠিক আছে। এবার বলুন তো একটা লোককে মাথার উপর থেকে দেখলে তাকে বেঁটে মনে হয় কেন ?'

লালমোহনবাবু চুপ করে হাঁ করে চেয়ে রইলেন। আবছা আলোয় দেখলাম তিনি হাত কচলাচ্ছেন। পাশের লোক দুটো এক সুরে একভাবে গল্প করে চলেছে। ফেলুদা একদৃষ্টে লালমোহনবাবুর দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

লালমোহনবাবু জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে বললেন, 'আমাকে এসব, মানে, কোশ্চেন—'

'আরেকটা প্রশ্ন আছে লালমোহনবাবু—এটার উত্তর আপনি নিশ্চয়ই জানেন।'

লালমোহনবাবু নির্বাক। ফেলুদা যেন তাঁকে হিপ্নোটাইজ করে ফেলেছে।

'আজ সকালে আপনি সার্কিট হাউসের পিছনের বাগানে আমার জানালার কাছে কী করছিলেন ?'

লালমোহনবাবু এক মুহূর্ত পাথর। তারপরেই তিনি একেবারে হাত-পা ছুঁড়ে হাউমাউ করে উঠলেন।

'আরে মশাই—আপনার কাছেই তো যাচ্ছিলুম ! আপনারই কাছে ! এমন সময় ময়ূরটা এমন চেঁচিয়ে উঠল—আর তারপর একটা চীৎকার শুনলাম—কেমন জানি নার্ভাস-টার্ভাস হয়ে...'

'আমার ঘরে যাবার কি অন্য রাস্তা ছিল না ? আর আমার কাছে আসার জন্য মাথায় পাগড়ি আর গায়ে চাদর দিতে হয় ?'

'আরে মশাই, গায়ের চাদর তো বিছানার চাদর, আর পাগড়ি তো সার্কিট হাউসের তোয়ালে। একটা ডিজগাইজ না হলে লোকটার উপর স্পাইং করব কী করে ?'

'কোন্ লোকটা ?'

'মিস্টার ট্রটার ! ভেরি সাস্‌পিশাস্ ! ভাগ্যে গেসলুম। কী পেলুম দেখুন না, ওর জানলার বাইরে ঘাসের উপর। সিক্রেট কোড ! এইটেই তো আপনাকে দিতে যাচ্ছিলুম, আর ঠিক এই সময় ময়ূরটা চেঁচামেচি লাগিয়ে সব ভণ্ডুল করে দিলে।'

আমি লক্ষ করছিলাম লালমোহনবাবুর ঘড়িটা। সত্যি, এই ঘড়িটাই তো দেখেছিলাম ছাত থেকে।

লালমোহনবাবু সুটকেস খুলে তার খাপ থেকে একটা কোঁকড়ানো কাগজের টুকরো বার করে ফেলুদাকে দিল। বুঝলাম কাগজটাকে দলা পাকানো হয়েছিল, সেটা আবার সোজা করা হয়েছে।

ফেলুদার পাশে গিয়ে কেরোসিনের আলোতে দেখলাম কাগজটায় পেনসিল দিয়ে লেখা আছে—

**IP 1625+U**





**U—M**

ফেলুদা ভীষণভাবে ভুরু কুঁচকে কাগজটার দিকে চেয়ে রইল। আমি এই অ্যালজেব্রার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝলাম না, যদিও লালমোহনবাবু দুবার ফিস্ ফিস্ করে বললেন, 'হাইলি সাস্‌পিশাস্।'

ফেলুদা ভাবছে, আর ভাবতে ভাবতে আপন মনে বিড়বিড় করছে—

'ষোল শ' পঁচিশ...ষোল শ' পঁচিশ...এই সংখ্যাটা কোথায় যেন দেখেছি রিসেন্টলি ?...'

'ট্যাক্সির নম্বর ?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'উঁহু...ষোল শ' পঁচিশ...সিক্সটিন টোয়েন্টি ফা—'

ফেলুদা কথাটা শেষ না করে এক ঝটকায় থলে থেকে ব্র্যাড্‌শ টাইম টেবলটা বার করল। পাতা ভাঁজ করা জায়গাটা খুলে পাতার উপর থেকে নিচের দিকে আঙুল চালিয়ে এক জায়গায় এসে থামল।

'ইয়েস। সিক্সটিন টোয়েন্টি ফাইভ হচ্ছে অ্যারাইভ্যাল।'

'কোথায় ?' জিজ্ঞেস করলাম।

'পোকরানে।'

বললাম, 'তা হলে তো Pটা পোকরান হতে পারে। পোকরানে সিক্সটিন টোয়েন্টি ফাইভ। আর বাকিটা ?'

'বাকিটা...বাকিটা...আই পি আবার প্লাস ইউ।'

'তলার Mটা কিন্তু ভালো লাগছে না মশাই,' লালমোহনবাবু বললেন। 'M বললেই কিন্তু মার্ডার মনে পড়ে।'

'দাঁড়ান মশাই—আগে ওপরেরটার পাঠোদ্ধার করি।'

লালমোহনবাবু বিড়বিড় করে বললেন, 'মার্ডার...মিস্ট্রি...ম্যাসাকার মনস্টার...'

ফেলুদা কোলের উপর কাগজটা খোলা রেখে ভাবতে লাগল।

লালমোহনবাবু গজার টিনটা বার করে আমাদের আবার অফার করলেন। আমি একটা নেবার পর ফেলুদার দিকে টিনটা এগিয়ে দিয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'ভালো কথা—আমিই যে আপনার জানালার কাছে গিয়েছিলুম, সেটা কী করে বুঝলেন স্যার ? আপনি কি আমায় দেখে ফেলেছিলেন নাকি ?'

ফেলুদা একটা গজা তুলে নিয়ে বলল, 'পাগড়িটা খোলার পর বোধহয় চুলটা আঁচড়াননি। ঘটনাটার কিছুক্ষণ পর যখন আপনার সঙ্গে দেখা হয়, তখন আপনার চুলের অবস্থাটা দেখেই সন্দেহ হয়েছিল।'

ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'কিছু মনে করবেন না স্যার আপনাকে কিন্তু সেন্ট-পারসেন্ট গোয়েন্দা বলেই মনে হচ্ছে।'

ফেলুদা এবার তার একটা কার্ড বার করে লালমোহনবাবুকে দিল। লালমোহনবাবুর দৃষ্টি উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

'ওঃ!—প্রদোষ সি মিটার! এটা কি আপনার রিয়্যাল নাম?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। সন্দেহের কোনো কারণ আছে কি?'

'না, মানে ভাবছিলাম কী অদ্ভুত নাম!'

'অদ্ভুত?'

'অদ্ভুত নয়? দেখুন না কেমন মিলে যাচ্ছে।—প্রদোষ—প্র হচ্ছে প্রফেশন্যাল, দোষ হচ্ছে ক্রাইম আর সি হচ্ছে—টু সি—অর্থাৎ দেখা—অর্থাৎ ইনভেস্টিগেট। অর্থাৎ প্রদোষ সি ইজ ইকুয়্যাল টু প্রফেশন্যাল ক্রাইম ইনভেস্টিগেটর!'

'সাধু সাধু!—আর মিটার?'

'মিটারটা একটু ভেবে দেখতে হবে,' লালমোহনবাবু মাথা চুলকে বললেন।

'কিস্যু ভাবার দরকার নেই। আমি বলে দিচ্ছি। ট্যাক্সি মিটার জানেন তো? সেই মিটার—অর্থাৎ ইন্ডিকেটর। তার মানে শুধু ইনভেস্টিগেশন নয়, অল্‌সো ইনডিকেশন। ক্রাইমের তদন্তই শুধু নয়, ক্রিমিন্যাল বার করে তার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ। হল তো?'

লালমোহনবাবু 'ব্রাভো' বলে হাততালি দিয়ে উঠলেন। ফেলুদা কিন্তু আবার সিরিয়াস। আরেকবার হাতের কাগজটার দিকে দেখে সেটাকে সার্টের বুক-পকেটে গুঁজে রেখে সিগারেটটা বার করে বলল, 'I এবং U-এর অবিশ্যি খুব সহজ মানে হতে পারে। I অর্থাৎ আমি এবং U অর্থাৎ তুমি, কিন্তু প্লাস ইউ-টা গোলমেলে। আর দ্বিতীয় লাইনটার কোনো কিনারাই করা যাচ্ছে না।...তোপ্‌সে, তুই বরং হোল্ড-অলটা বিছিয়ে শুয়ে পড়। আপনিও—লালমোহনবাবু। এখনো তো সাড়ে সাত ঘণ্টা দেরি ট্রেন আসতে। আমি আপনাদের ঠিক সময়ে তুলে দেবো।'

কথাটা মন্দ বলেনি ফেলুদা। শুধু স্ট্র্যাপ দুটো খুলে হোল্ড-অলটাকে বিছিয়ে প্ল্যাটফর্মের উপর শুয়ে পড়লাম। চিত হওয়ামাত্র আকাশের দিকে চোখ গেল, আর তক্ষুনি বুঝতে পারলাম যে একসঙ্গে এত তারা আমি জীবনে কখনো



তড়াক করে উঠে হোল্ড-অল বেঁধে ফেলতে ফেলতে ট্রেনের হেড-লাইট দেখা গেল।

॥ ১০ ॥

মিটার গেজের প্যাসেঞ্জার গাড়ি। কামরাগুলো তাই খুবই ছোট। যাত্রীও বেশি নেই, তাই একটা খালি ফার্স্ট ক্লাস পাওয়াতে খুব একটা অবাক লাগল না।

কামরা অন্ধকার; হাতড়িয়ে সুইচ বার করে টিপে কোনো ফল হলো না। লালমোহনবাবু বললেন, 'সভ্য দেশেই রেলের বাল্‌ব লোপাট হয়ে যায়, ডাকাতের দেশে তো ওটা আশা করাই ভুল।'

ফেলুদা বলল, 'তোরা দু'জন দু'দিকের বেঞ্চিতে শুয়ে পড়। আমি মাঝখানের মেঝেতে শতরঞ্চি পেতে ম্যানেজ করছি। ঝাড়া ছ' ঘণ্টা সময় আছে হাতে, দিব্যি গড়িয়ে নেওয়া যাবে।'

লালমোহনবাবু একবার একটু আপত্তি করেছিলেন—'আপনি আবার ফ্লোরে কেন মশাই, আমাকে দিন না'—কিন্তু ফেলুদা একটু কড়া করে 'মোটেই না' বলাতে ভদ্রলোক বোধহয় গাঁটের ব্যথার কথা ভেবেই বেঞ্চিতে হোল্ড-অল খুলে পেতে নিলেন।

গাড়ি ছেড়ে প্ল্যাটফর্ম পেরোনোর এক মিনিটের মধ্যেই কে একজন আমাদের দরজার পা-দানিতে লাফিয়ে উঠল। লালমোহনবাবু হেসে বলে উঠলেন, 'আরে বাবা, গাড়ি রিজার্ভ হ্যায়। জেনানা কাম্‌রা হ্যায়!'

এবারে ঝড়াক্ করে আমাদের দরজাটা খুলে গেল, আর একটা উজ্জ্বল টর্চের আলো জ্বলে উঠে কয়েক মুহূর্তের জন্য আমার চোখ ধাঁধিয়ে দিল।

সেই আলোতেই দেখলাম, একটা হাত আমাদের দিকে এগিয়ে এসেছে, আর সে হাতে চকচক করছে একটা লোহার নলওয়ালা জিনিস।

আমাদের তিনজনেরই হাত মাথার উপর উঠে গেল।

কোনোদিন ভুলব না। ফেলুদার ডান হাতটা একটা বিদ্যুতের শিখার মতো নেমে এসে তার নিজের শতরঞ্চির সামনের দিকটা খামচে ধরে মারল একটা প্রচণ্ড হ্যাঁচকা টান—আর তার ফলে মন্দার বোসের পা দুটো সামনের দিকে হড়কে ছটকে শূন্যে উঠে গিয়ে উপরের শরীরটা এক ঝটকায় চিতিয়ে দড়াম করে লাগল কামরার দেয়ালে। আর সেই সঙ্গে তার ডান হাত থেকে রিভলভারটা ছিটকে বেরিয়ে গিয়ে পড়ল লালমোহনবাবুর বেঞ্চিতে আর বাঁ হাত থেকে জ্বলন্ত টর্চটা ফসকে গিয়ে পড়ল মেঝেতে।

মন্দার বোসের পুরো শরীরটা মাটিতে পড়বার আগেই লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে ফেলুদা—তার হাতে কোটের ভিতর থেকে বার করা তার নিজের রিভলভার।

'গেট আপ!' ফেলুদা মন্দার বোসকে উদ্দেশ করে গর্জিয়ে উঠল।

মিটার গেজের গাড়ি প্রচণ্ড শব্দ করে দুলে দুলে এগিয়ে চলেছে মরুভূমির মধ্যে দিয়ে। লালমোহনবাবু ইতিমধ্যে মন্দারবাবুর রিভলভারটা তার জাপান এয়ার লাইনস্‌-এর ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছেন।

'উঠুন বলছি!' ফেলুদা আবার গর্জিয়ে উঠল।

টর্চটা মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে, অথচ বুঝতে পারছি সেটা মন্দার বোসের উপর ফেলা উচিত—নইলে লোকটা অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে একটা গোলমাল করতে পারে। এই কথাটা ভেবে টর্চটা তুলতে গিয়েই হয়ে গেল সর্বনাশ; আর সেটা এমনই সর্বনাশ যে সেটার কথা ভাবতে এখনো আমার রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে যায়। মন্দার বোসের শরীরের উপর দিকটা ছিল আমার বেঞ্চির দিকে। আমি যেই টর্চটা তুলতে নিচু হয়েছি, ভদ্রলোক তৎক্ষণাৎ একটা আচমকা ঝাঁপ দিয়ে আমাকে জাপটে ধরে আমাকে সুদ্ধ উঠে দাঁড়ালেন। তার ফলে মন্দার বোস আর ফেলুদার মাঝখানে পড়ে গেলাম আমি। এই চরম বিপদের সময়েও মনে মনে লোকটার শয়তানি বুদ্ধির তারিফ না করে পারলাম না। বুঝতে পারলাম, ফেলুদা প্রথম রাউণ্ডে আশ্চর্য ভাবে জিতলেও, দ্বিতীয় রাউন্ডে বেকায়দায় পড়ে গেছে। এটাও বুঝলাম যে এই অবস্থাটার জন্য দায়ী একমাত্র আমি।

মন্দার বোস আমাকে পিছন থেকে আঁকড়ে ধরে সামনের দিকে রেখে খোলা দরজাটার দিকে পিছোতে লাগলেন। কাঁধের কাছটায় কী যেন একটা ফুটছে। বুঝলাম সেটা মন্দার বোসের হাতের একটা নখ। নীলুর হাতের যন্ত্রণার কথা মনে পড়ে গেল।

ক্রমে বুঝলাম দরজার খুব কাছে এসে গেছি। কারণ বাইরে থেকে কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া এসে আমার বাঁ কাঁধটায় লাগছে।

আরো এক পা পিছোলেন মন্দার বোস। ফেলুদা রিভলভার উঁচিয়ে রয়েছে





কিন্তু কিছু করতে পারছে না। জ্বলন্ত টর্চটা এখনো ট্রেনের দোলার সঙ্গে সঙ্গে মেঝের এদিকে ওদিকে গড়াচ্ছে।

হঠাৎ পিছন থেকে একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে আমি ফেলুদার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। আর তার পরেই একটা শব্দ পেলাম যাতে বুঝলাম যে, মন্দার বোস চলন্ত ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়েছেন। তিনি বাঁচলেন কী মরলেন, সেটা বোঝার কোনো উপায় নেই।

ফেলুদা দরজা দিয়ে গলা বাড়িয়ে কিছুক্ষণ দেখে ফিরে এল। তারপর যথাস্থানে রিভলভারটাকে চালান দিয়ে নিজের জায়গায় বসে পড়ে বলল,

'দু-একটা হাড়গোড় অন্তত না ভাঙলে খুব আক্ষেপের কারণ হবে।'

লালমোহনবাবু যেন একটু অতিরিক্ত জোরেই হেসে উঠে বললেন,

'বলেছিলাম না মশাই, লোকটা সাস্‌পিশাস্‌।'

আমি এর মধ্যে ফ্লাস্ক থেকে খানিকটা জল খেয়ে নিয়েছি। বুকের ধড়ফড়ানিটা আস্তে আস্তে কমছিল, নিশ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে আসছিল। কী ভীষণ একটা ঘটনা কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ঘটে গেল, সেটা যেন এখনো ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারছিলাম না।

ফেলুদা বলল, 'শ্রীমান্ তপেশ ছিলেন বলে লোকটা এ-যাত্রা পার পেয়ে গেল, নইলে বন্দুকটা নাকের সামনে ধরে ওর পেট থেকে সব বার করে নিতাম। অবিশ্যি—'

ফেলুদা থামল। তারপর বলল, 'খুব বড় বিপদের সামনে পড়লেই দেখছি আমার মাথাটা বিশেষ রকম পরিষ্কার হয়ে যায়। ওই সংকেতের মানেটা এখন স্পষ্ট বুঝতে পারছি।'

'বলেন কী!' বললেন লালমোহনবাবু।

ফেলুদা বলল, 'আসলে খুবই সহজ। আই হচ্ছে আমি, পি হচ্ছে পোকরান, ইউ হচ্ছে তুমি, আর এম্ হচ্ছে মিত্তির—প্রদোষ মিত্তির।'

'আর প্লাস-মাইনাস?'

'আই পি ১৬২৫+ইউ। অর্থাৎ আমি পোকরান পৌঁচচ্ছি বিকেল চারটে পঁচিশে, তুমি আমার সঙ্গে এসে যোগ দিও।'

'আর ইউ মাইনাস এম্?'

'আরো সহজ—তুমি মিত্তিরকে কাটাও।'

'কাটাও!' ধরা গলায় বললেন লালমোহনবাবু। 'তার মানে মাইনাস হচ্ছে মার্ডার?'

'মার্ডারের প্রয়োজন কী? মাঝপথে চলন্ত ট্রেন থেকে নামিয়ে দিলে এক তো জখম হবার সম্ভাবনা ছিলই, তার উপর চব্বিশ ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হত পরের ট্রেনের জন্য। তার মধ্যে ওদের কার্যসিদ্ধি হয়ে যেত। দরকারটা ছিল আমাদের জয়সলমীর থেকে মাইনাস করা। সেই জন্যেই তো রাস্তায় এত পেরেকের ছড়াছড়ি। সেটায় কাজ হয়নি বুঝতে পেরে শেষটায় ট্রেন থেকে নামানোর চেষ্টা।'

এতক্ষণে হঠাৎ একটা জিনিস খেয়াল করলাম। ফেলুদাকে বললাম, 'চুরুটের গন্ধ পাচ্ছি ফেলুদা।'

ফেলুদা বলল, 'সেটা লোকটা কামরায় ঢোকামাত্র পেয়েছি। সার্কিট হাউসেও কোনো ব্যক্তি যে চুরুট খাচ্ছেন সেটা আগেই বুঝেছি। মুকুলের হাতের সেই রাঙতাটা চুরুটেই জড়ানো থাকে।'

'আর ভদ্রলোকের একটা নখ ভীষণ বড়ো। আমার কাঁধটা বোধহয় নীলুর





হাতের মতোই ছড়ে গেছে।'

'কিন্তু যিনি ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছেন সেই আই-টি কিনি?' জিজ্ঞেস করলেন লালমোহনবাবু।

ফেলুদা গম্ভীর গলায় বলল, 'সার্কিট হাউসে পাওয়া ইংরিজিতে লেখা হুমকি চিঠির সঙ্গে এই সংকেতের লেখা মিলিয়ে তো একট লোকের কথাই মনে হয়।'

'কে?' আমরা দু'জনে এক সঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম।

'ডক্টর হেমাঙ্গমোহন হাজরা।'

রাত্রে সবসুদ্ধ বোধহয় ঘণ্টা তিনেক ঘুমিয়েছি। যখন ঘুম ভাঙল তখন বাইরে রোদ। ফেলুদাকে দেখলাম মেঝে থেকে উঠে আমার বেঞ্চির এক কোণে বসে বাইরের দিকে চেয়ে রয়েছে। তার কোলে রয়েছে তার নীল খাতা, আর হাতে রয়েছে দু'খানা চিঠি—একটা সেই ইংরিজিতে হুমকি আর অন্যটা ডক্টর হাজরার লেখা চিঠি। ঘড়িতে দেখি পৌনে সাতটা। লালমোহনবাবু এখনো দিব্যি ঘুমোচ্ছেন। খিদে পাচ্ছিল ভীষণ, কিন্তু গজা খেতে আর মন চাইছিল না। জয়সলমীর পৌঁছবে প্রায় ন'টায়। বুঝলাম এই দু ঘণ্টা সময় খিদেটাকে কোনোরকম চেপে রাখতে হবে।

বাইরের দৃশ্য অদ্ভুত।মাইলের পর মাইল অল্প ঢেউ-খেলানো জমি দেখা যাচ্ছে দু'দিকে—তার মধ্যে একটা বাড়ি নেই, একটা লোক নেই, একটা গাছ পর্যন্ত নেই। অথচ মরুভূমি বলা যায় না, কারণ, বালি মাঝে মাঝে থাকলেও, বেশির ভাগটাই শুকনো সাদা ঘাস, লালচে মাটি আর লাল-কালো পাথরের কুচি। এরপরেও যে আবার একটা শহর থাকতে পারে সেটা ভাবলে বিশ্বাস হতে চায় না।

একটা স্টেশন এল—জেঠা চন্দন। আমি ব্র্যাড্‌শ খুলে দেখলাম এটার পর থাইয়ৎ হামিরা, আর তার পরেই জয়সলমীর। স্টেশনে দোকান-টোকান নেই, লোকজন নেই, কুলি নেই, ফেরিওয়ালা নেই। সব মিলিয়ে মনে হয় যেন পৃথিবীর কোনো একটা অনাবিষ্কৃত জায়গায় এই ট্রেনটা কেমন করে জানি এসে পড়েছে—ঠিক যেমনি করে রকেট গিয়ে হাজির হয় চাঁদে।

এবার গাড়ি ছাড়ার মিনিটখানেক পরেই লালমোহনবাবু উঠে পড়ে বিরাট একটা হাই তুলে বললেন, 'ফ্যান্ট্যাস্টিক স্বপ্ন দেখলুম মশাই। একদল ডাকাত, গোঁফগুলো সব ভেড়ার শিঙের মতো প্যাঁচানো—তাদের আমি হিপ্‌নোটাইজ করে নিয়ে চলেছি একটা কেল্লার ভিতর দিয়ে। সেই কেল্লায় একটা সুড়ঙ্গ। তাই দিয়ে একটা আন্ডারগ্রাউন্ড চেম্বারে পৌঁছালুম। জানি সেখানে গুপ্তধন আছে, কিন্তু গিয়ে দেখি একটা উট মেঝেতে বসে জিভেগজা খাচ্ছে।'

'গজা খাচ্ছে সেটা জানলেন কী করে ?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল। 'হাঁ করে দেখাল ?'

'আরে না মশাই। স্পষ্ট দেখলুম আমার দালদার টিনটা খোলা পড়ে আছে উটের ঠিক সামনে।'

থাইয়ৎ হামিরা স্টেশন পেরনোর কিছুক্ষণ পরেই দূরে আবছা একটা পাহাড় চোখে পড়ল। এ-ও সেই রাজস্থানী চ্যাপটা টেব্‌ল মাউন্টেন। আমাদের ট্রেনটা মনে হল সেই পাহাড়ের দিকে যাচ্ছে।

আটটা নাগাদ মনে হল পাহাড়টার উপর একটা কিছু রয়েছে।

ক্রমে বুঝতে পারলাম, সেটা একটা কেল্লা। সমস্ত পাহাড়ের উপরটা জুড়ে মুকুটের মতো বসে আছে কেল্লাটা—তার উপর সোজা গিয়ে পড়েছে ঝকঝকে পরিষ্কার সকালের ঝলমলে রোদ। আমার মুখ থেকে একটা কথা আপনা থেকেই বেরিয়ে পড়ল—

'সোনার কেল্লা !'

ফেলুদা বলল, 'ঠিক বলেছিস। এটাই হল রাজস্থানের একমাত্র সোনার কেল্লা। বাটিটা দেখেই সন্দেহ হয়েছিল। তারপর গাইডবুক দেখে কন্‌ফার্মড হলাম। বাটিটা যে পাথরের তৈরি, কেল্লাও সেই পাথরেরই তৈরি—ইয়েলো স্যান্ডস্টোন। মুকুল যদি সত্যি করেই জাতিস্মর হয়ে থাকে, আর পূর্বজন্ম বলে যদি সত্যিই কিছু থেকে থাকে, তাহলে মনে হয় ও এখানেই জন্মেছিল।'

আমি বললাম, 'কিন্তু ডক্টর হাজরা কি সেটা জানেন ?'

ফেলুদা এ কথার কোনো উত্তর না দিয়ে একদৃষ্টে কেল্লার দিকে চেয়ে থেকে বলল, 'জানিস তোপ্‌সে—অদ্ভুত এই সোনালি আলো। মাকড়সার জালের নকশাটা চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি এই আলোয়।'

## ॥ ১১ ॥

জয়সলমীর স্টেশনে নেমে প্রথমেই যেটা করলাম সেটা হচ্ছে একটা খাবারের দোকানে গিয়ে চা আর একটা নতুন রকমের মিষ্টি খেয়ে খিদেটাকে মিটিয়ে নিলাম। ফেলুদা বলল—মিষ্টি জিনিসটা নাকি দরকার—ওতে গ্লুকোজ থাকে—সামনে পরিশ্রম আছে—গ্লুকোজে এনার্জি দেবে।

স্টেশনের বাইরে এসে দেখলাম গাড়িটাড়ির কোনো বালাই নেই। একটা জীপ আছে দাঁড়িয়ে, তবে সেটা যে ভাড়ার নয়, সেটা দেখেই বোঝা যায়। টাঙ্গা এক্কা সাইক্‌ল-রিক্‌শা ট্যাক্সি কিচ্ছু নেই। আমরা যখন ট্রেন থেকে নেমেছিলাম তখন একটা কালো অ্যাম্বাসাডর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম ; এখন দেখছি সে





গাড়িটাও নেই। ফেলুদা বলল, 'জায়গাটা ছোট সেটা বোঝাই যাচ্ছে। কাজেই এক জায়গা থেকে আরেক জায়গার দূরত্ব বেশি নয় নিশ্চয়ই। ডাকবাংলো একটা আছে সেটা গাইড-বুকে লিখেছে। আপাতত সেটার খোঁজ করা যাক।'

যে যার মালপত্তর হাতে নিয়ে স্টেশন থেকে বেরিয়ে পড়লাম। কাছেই একটা পেট্রোল স্টেশনে একটা লোককে জিজ্ঞেস করতেই সে রাস্তা বাতলে দিল। বুঝলাম যে ডাকবাংলোয় যাবার জন্য পাহাড়ে উঠতে হবে না, সেটা পাহাড়ের দক্ষিণ দিকে সমতল জমির উপরেই। হাঁটতে হাঁটতে রাস্তার বালির উপর টায়ারের দাগ দেখে ফেলুদা বলল, 'অ্যাম্বাসাডরটাও এই রাস্তাতেই গেছে বলে মনে হচ্ছে।'

প্রায় মিনিট পনেরো হাঁটার পর একটা একতলা বাড়ির সামনে কাঠের ফলকে লেখা দেখে বুঝলাম আমরা ডাকবাংলোয় এসে গেছি। বাংলোর সামনেই দেখি কালো অ্যাম্বাসাডরটা দাঁড়িয়ে আছে।

আমাদের দেখতে পেয়েই বোধহয় একটা খাকি সার্ট খাটো ধুতি আর পাকানো পাগড়ি পরা বুড়ো লোক পাশের একটা আউট-হাউস থেকে বেরিয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে এল। ফেলুদা তাকে হিন্দিতে জিজ্ঞেস করল সে চৌকিদার কিনা। লোকটা মাথা নেড়ে হ্যাঁ বুঝিয়ে দিল। তার চাউনি দেখে বুঝলাম যে আমাদের আসাটা তার কাছে অপ্রত্যাশিত, আর ব্যাপারটা সে একটু সন্দেহের চোখে দেখছে, কারণ পারমিশন ছাড়া বাংলোয় থাকতে দেয় না এটা আমি জানি।

ফেলুদা বাংলোয় থাকার প্রশ্নটাই তুলল না। সে বলল যে আপাতত সে শুধু মালগুলো রেখে যেতে চায়, তারপর পারমিশনের চেষ্টা দেখবে। চৌকিদার বলল সেটার জন্য রাজার সেক্রেটারির কাছে যেতে হবে। রাজবাড়ি কোনদিকে সেটাও সে হাত তুলে দেখিয়ে দিল। দূরে গাছপালার মাথার উপর দিয়ে হলদে পাথরের তৈরি প্যালেসের খানিকটা অংশও দেখতে পেলাম।

চৌকিদার মালগুলো রাখতে দিতে কোনো আপত্তি করল না। তার একটা কারণ অবিশ্যি এই যে, ফেলুদা ইতিমধ্যে তার হাতে একটা কড়কড়ে দু' টাকার নোট গুঁজে দিয়েছে।

একটা ঘরের মধ্যে সুটকেস বিছানা রেখে ফ্লাস্কগুলোতে জল ভরে কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে চৌকিদারকে জিজ্ঞেস করা হল কেল্লায় যেতে হলে কোন রাস্তা দিয়ে যেতে হবে।

'ইউ ওয়ান্ট টু গো টু দ্য ফোর্ট ?'

প্রশ্নটা এল বারান্দার ও-মাথা থেকে। একটি ভদ্রলোক ওদিকের একটা ঘর থেকে সবেমাত্র বেরিয়েছেন। ফর্সা রং, বয়স চল্লিশের বেশি নয়, খুব মন দিয়ে ছাঁটা সরু একটা গোঁফ চোখা নাকের নিচে। এবার আরেকটু বেশি বয়সের

আরেকটি ভদ্রলোক ঘর থেকে বেরিয়ে প্রথম ভদ্রলোকটির পাশে দাঁড়ালেন। এঁর হাতে একটা লাঠি—যেমন লাঠি আমরা যোধপুরের বাজারে দেখেছি—আর গায়ে কেমন যেন একটা বেখাপ্পা কালো স্যুট। এরা দু'জনে কোন্ দেশী সেটা বোঝা গেল না। লক্ষ করলাম দ্বিতীয় ভদ্রলোকটি একটু যেন খোঁড়াচ্ছেন, আর সেই জন্যেই বোধহয় তার লাঠির দরকার হচ্ছে।

ফেলুদা বলল, 'ফোর্টটা একবার দেখতে পারলে মন্দ হত না।'

'কাম অ্যালঙ্গ উইথ আস্—উই আর গোয়িং দ্যাট ওয়ে।'

ফেলুদা কয়েক সেকেন্ডের জন্য কী জানি ভেবে যেতে রাজী হয়ে গেল।

'থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ্। দ্যাট ইজ ভেরি কাইন্ড অফ ইউ।'

আমরা গাড়ির দিকে যাবার সময় লালমোহনবাবু ফিসফিস করে বললেন, 'এরা আবার চলন্ত মোটরগাড়ি থেকে নামিয়ে দিতে চাইবে না তো?'

গাড়ি কেল্লার দিকে রওনা দিল। লাঠিওয়ালা ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, 'আর ইউ ফ্রম ক্যালকাটা?'

ফেলুদা বলল, 'হ্যাঁ।'

বাঁ দিকে বালির উপর দূরে দেখলাম দেবীকুণ্ডের মতো কতগুলো স্মৃতিস্তম্ভ রয়েছে। ফেলুদা বলল ও জিনিসটা নাকি রাজস্থানের সব শহরেই রয়েছে।

আমাদের গাড়ি ক্রমে পাহাড়ের গা বেয়ে চড়াই উঠতে আরম্ভ করল।

মিনিটখানেক ওঠার পর পিছন থেকে আরেকটা গাড়ির শব্দ পেলাম। গাড়িটা ক্রমাগত হর্ন দিচ্ছে। অথচ আমরা যে খুব আস্তে চলছিলাম তাও নয়। তাহলে লোকটা বার বার হর্ন দিচ্ছে কেন?

ফেলুদা দুই ভদ্রলোকের সঙ্গে পিছনে বসেছিল। সে হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে কাঁচের মধ্যে দিয়ে দেখে নিয়ে আমাদের গাড়ির ড্রাইভারকে উদ্দেশ করে বলে উঠল, 'রোক্‌কে, রোক্‌কে!'

আমাদের গাড়ি রাস্তার এক পাশে থামতেই আমাদের ডান পাশে এস দাঁড়াল একটা ট্যাক্সি—তার স্টিয়ারিং ধরে হাসিমুখে বসে আমাদের সেলাম জানাচ্ছেন গুরুবচন সিং।

আমরা তিনজনেই নেমে পড়লাম। ফেলুদা ভদ্রলোক দু'জনকে ইংরিজিতে বলল—আপনাদের অনেক ধন্যবাদ। আমাদের নিজেদের ট্যাক্সিটা পথে খারাপ হয়ে গিয়েছিল—সেটা এসে পড়েছে।

গুরুবচন বলল ভোর সাড়ে ছটায় নাকি একটা চেনা ট্যাক্সি জয়সলমীর থেকে ফিরছিল—তার কাছ থেকে স্পেয়ার চেয়ে নিয়েছে। নব্বই মাইল রাস্তা নাকি সে দু' ঘণ্টায় এসেছে। এখানে এসে পেট্রোল স্টেশনটায় দাঁড়িয়ে ছিল, হঠাৎ কালো অ্যাম্বাসাডরটার ভিতর আমাদের দেখতে পায়।





আরো খানিকটা পথ যেতেই আমরা একটা বাজারের মধ্যে এসে পড়লাম। চারদিকে দোকানপাট গিজগিজ করছে, লাউডস্পীকারে হিন্দী ফিল্মের গান হচ্ছে, একটা ছোট্ট সিনেমা হাউসের বাইরে আবার হিন্দী ছবির বিজ্ঞাপনও রয়েছে।

'আপলোগ কিল্লা দেখনে মাংতা?' গুরুবচন সিং জিজ্ঞেস করল। ফেলুদা হ্যাঁ বলতে গুরুবচন সিং ট্যাক্সি থামাল। 'ইয়ে হ্যায় কিল্লেকা গেট।'

ডান দিকে চেয়ে দেখি এক পেল্লায় ফটক—তারপর পাথরে বাঁধানো রাস্তা চড়াই উঠে গেছে আরেকটা ফটকের দিকে। বুঝলাম, এটা বাইরের গেট আর ভেতরেরটা আসল গেট। দ্বিতীয় গেটের পিছন থেকেই খাড়াই উঠে গেছে জয়সলমীরের সোনার কেল্লা।

গেটের বাইরে একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখলেই প্রহরী বলে বোঝা যায়। ফেলুদা তাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করল সকালের দিকে কোনো বাঙালী ভদ্রলোক একটি ছোট ছেলেকে সঙ্গে করে কেল্লা দেখতে এসেছিলেন কিনা। ফেলুদা হাত দিয়ে মুকুলের হাইটটাও বুঝিয়ে দিল।

—আয়া থা, কিন্তু এখন নেই, চলে গেছে।

—কখন?

—আধ ঘণ্টা হবে।

—গাড়িতে এসেছিল?

—হাঁ—এক টেক্সি থা।

—কোন্ দিকে গেছে বলতে পার?

প্রহরী পশ্চিম দিকের রাস্তাটা দেখিয়ে দিল। আমরা সেই রাস্তা ধরে অলিগলি দোকানপাটের মধ্যে দিয়ে চলতে লাগলাম। লালমোহনবাবু সামনে বসেছেন গুরুবচনের পাশে, আমি আর ফেলুদা পিছনে। কিছুক্ষণ চলার পর ফেলুদা হঠাৎ প্রশ্ন করল, 'আপনার অস্ত্রটা আনেননি তো সঙ্গে?'

লালমোহনবাবু অন্যমনস্কতার মধ্যে হঠাৎ প্রশ্ন শুনে চমকে বললেন, 'ভোপালি? ইয়ে-মানে-গিয়ে-আপনার—ভোজালি?'

'হ্যাঁ। আপনার নেপালী ভোজালি।'

'সে তো সুটকেসে স্যার।'

'তাহলে আপনার পাশে রাখা জাপান এয়ার লাইন্সের ব্যাগ থেকে মন্দার বোসের রিভলভারটা বার করে কোটের তলায় বেল্টের মধ্যে গুঁজুন—যাতে বাইরে থেকে বোঝা না যায়।'

লালমোহনবাবুর নড়াচড়া থেকে বুঝলাম তিনি ফেলুদার আদেশ পালন করছেন। এই সময় তার মুখটা দেখতে ভীষণ ইচ্ছে করছিল।

'কিচ্ছু না,' ফেলুদা বলল, 'গোলমাল দেখলে স্রেফ ট্যাঁক থেকে ওটি বার করে

সামনের দিকে পয়েন্ট করে দাঁড়িয়ে থাকবেন।'

'আর পে-পেছন দিয়ে যদি—'

'পেছনে কিছু হচ্ছে বুঝলে আপনি নিজে ঘুরে যাবেন, তখনই সেটা সামনে হয়ে যাবে।'

'আর আপনি ? আপনি বুঝি আজ, মানে, নন-ভায়োলেন্ট ?'

'সেটা প্রয়োজন বুঝে।'

ট্যাক্সিটা বাজার ছাড়িয়ে একটা খোলা জায়গায় এসে পড়ল। আমরা এর মধ্যে আরো দু-একজনকে জিজ্ঞেস করে অন্য ট্যাক্সিটা কোন পথে গেছে জেনে নিয়েছি। তাছাড়া রাস্তার বালির উপর মাঝে মাঝে টায়ারের দাগ দেখতে পাচ্ছি আর তাতেই বুঝতে পারছি যে আমরা হেমাঙ্গ হাজরার রাস্তাতেই চলেছি।

গুরুবচন সিং বলল, 'ইয়ে হ্যায় মোহনগড় জানেকা রাস্তা। আউর এক মিল জানা সেক্‌তা। উস্‌কে বাদ রাস্তা বহুৎ খারাপ হ্যায়। জীপ ছোড়কে দুস্‌রা গাড়ি নেহি যাতা।'

এক মাইলও অবিশ্যি যেতে হল না। কিছু দূর গিয়েই দেখতে পেলাম রাস্তার এক ধারে একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তার ডান দিকে খানিকটা দূরে রয়েছে একসঙ্গে অনেকগুলো পরিত্যক্ত একতলা ছাত ছাড়া খুপরির মতো পাথরের বাড়ি। বুঝলাম, এটাও হচ্ছে একটা প্রাচীন গ্রাম, যেমন গ্রাম আমরা এর আগে আরো দু-একটা দেখেছি। এসব গ্রাম থেকে লোকজন নাকি বহুকাল আগে চলে গেছে ; শুধু দেয়ালগুলো পাথরের তৈরি বলে এখনো দাঁড়িয়ে আছে।

গুরুবচন সিংকে অপেক্ষা করতে বলে আমরা বাড়িগুলোর দিকে এগোলাম। সর্দারজী দেখলাম গাড়ি থেকে নেমে অন্য ট্যাক্সির দিকে এগিয়ে গেল—বোধহয় জাতভাইয়ের সঙ্গে আড্ডা মারতে।

চারিদিক থমথম করছে। পিছন দিকে চাইলে দূরে দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের মাথায় জয়সলমীরের কেল্লা। রাস্তার উলটো দিকে খাড়াই উঠে গেছে পাহাড়। তার ঠিক পায়ের কাছে একটা প্রকাণ্ড খোলা জায়গা জুড়ে মাটিতে পোঁতা শিল-নোড়ার মতো হলদে পাথরের সারি। ফেলুদা ফিসফিস করে বলল, 'যোদ্ধাদের কবর।'

লালমোহনবাবু খসখসে মিহি গলায় বললেন, 'আমার কিন্তু আবার লো ব্লাড প্রেশার।'

'কিচ্ছু ভাববেন না', ফেলুদা বলল, 'দেখতে দেখতে হাই হয়ে যেমনটি চাই তেমনটি হয়ে যাবে।'

বাড়িগুলোর কাছে এসে পড়েছি। সারি সারি বাড়ির মাঝখান দিয়ে চলে গেছে সোজা রাস্তা। বেশ বুঝলাম এ গ্রাম বাংলাদেশের গ্রামের মতো নয়। এর মধ্যে





একটা সহজ জ্যামিতিক প্ল্যান আছে।

কিন্তু ট্যাক্সির যাত্রীরা কোথায় ? মুকুল কোথায় ? ডক্টর হেমাঙ্গ হাজরা কোথায় ?

মুকুলের কিছু হয়নি তো ?

হঠাৎ খেয়াল হল কানে একটা শব্দ আসছে—এখনো খুবই আস্তে—কিন্তু কান পাতলে শোনা যায়। খট্—খট্—খট্...

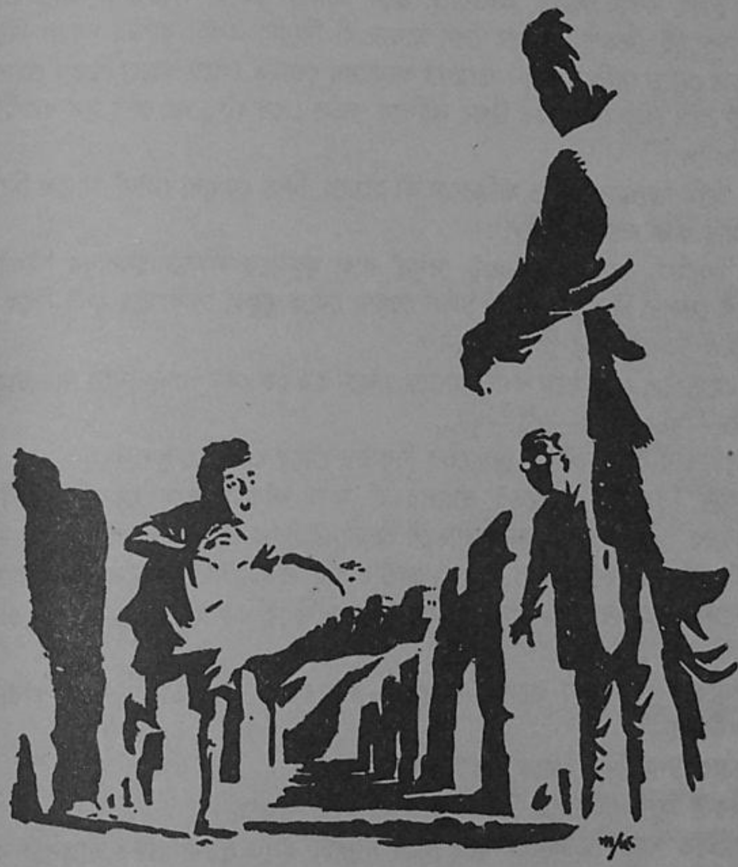

অত্যন্ত সাবধানে একটুও শব্দ না করে আরো কয়েক পা এগিয়ে দেখলাম, একটা চৌরাস্তায় এসে পড়েছি। আমরা এখনো দুটো রাস্তার ক্রসের মাঝখানে

দাঁড়িয়ে আছি। ডান দিক দিয়ে শব্দটা আসছে। রাস্তার দু'দিকে দশ-বারোটা বাড়ির সারি—তাদের দেয়াল আর দরজার ফাঁকগুলো শুধু দাঁড়িয়ে আছে।

আমরা ডানদিকের রাস্তাটা ধরেই পা টিপে টিপে এগোতে লাগলাম।

ফেলুদা দাঁতের ফাঁক দিয়ে প্রায় শোনা যায় না এমনভাবে বলল, 'রিভলভার'—আর সেই সঙ্গে তার নিজের হাতটাও চলে গেল কোটের ভিতর। আড়চোখে দেখলাম লালমোহনবাবুর হাতেও রিভলভার এসে গেছে, আর সেটা অসম্ভব কাঁপছে।

হঠাৎ একটা খচমচ আওয়াজ শুনে আমরা থমকে দাঁড়ালাম, আর তার পরমুহূর্তেই দেখলাম রাস্তার শেষ মাথায় বাঁ দিকের একটা বাড়ির দরজা দিয়ে মুকুল দৌড়ে বেরিয়ে এল—তারপর আমাদের দেখতে পেয়ে আরো দ্বিগুণ জোরে ছুটে এসে ফেলুদার বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সে হাঁপাচ্ছে, তার মুখ রক্তহীন ফ্যাকাসে।

আমি জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম কী হয়েছে, কিন্তু ফেলুদা ঠোঁটে আঙুল দিয়ে আমার কথা বন্ধ করে দিল।

ফিসফিস করে 'একে একটু দেখুন' বলে মুকুলকে লালমোহনবাবুর জিম্মায় রেখে ফেলুদা নিঃশব্দে এগিয়ে চলল যেখান থেকে মুকুল বেরিয়েছে সেই দিকে। আমিও চললাম তার পিছন পিছন।

এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে শব্দটা বাড়ছে। মনে হয় কে যেন পাথর নিয়ে নাড়াচাড়া করছে—খট্—খটাং—খুট্—খুট্...

বাড়িটার কাছে পৌঁছে দেয়ালের দিকটায় ঘেঁষে গেল ফেলুদা।

আর তিন পা বাড়াতেই দরজার হাঁ করা ফাঁকটা দিয়ে দেখলাম ডক্টর হাজরাকে। ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে পিঠ করে পাগলের মতো একটা ভাঙা পাথরের স্তূপ থেকে একটার পর একটা পাথর তুলে এক পাশে ফেলছেন। আমরা যে এসে দরজার মুখে দাঁড়িয়ে তাকে দেখছি, সেটা তাঁর খেয়াল নেই।

আরেক পা সামনে এগোল ফেলুদা—তার হাতে রিভলভার ডক্টর হাজরার দিকে উঁচোনো।

হঠাৎ উপর দিক থেকে একটা ঝটপট শব্দ।

একটা ময়ূর পাঁচিলের উপর থেকে লাফিয়ে পড়েছে।

মাটিতে পড়েই তীরবেগে ছুটে গিয়ে ময়ূরটা উপুড় হওয়া ডক্টর হাজরার বাঁ কানের ঠিক নিচে একটা সাংঘাতিক ঠোকর মারল। ডক্টর হাজরা যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে হাত দিয়ে ঠোকরানোর জায়গাটা চেপে ধরতেই তার সাদা সার্টের আস্তিনটা লাল হয়ে উঠল।





এদিকে ময়ূরটা ঠোকর মেরেই চলেছে। তার মধ্যেই ডক্টর হাজরা পালাতে গিয়ে আমাদের সামনে দেখে ভূত দেখার মতো ভাব করলেন। আমরা দরজা ছেড়ে পিছিয়ে দাঁড়ালাম, আর ময়ূর তাকে ঠুকরে ঘর থেকে বার করে দিল।

'গুপ্তধনের জায়গায় যে ময়ূরের বাসা থাকবে, আর তার মধ্যে যে ডিম থাকবে—এটা বোধহয় আপনি ভাবতে পারেননি—তাই না?'

ফেলুদার গলার স্বর ইস্পাত, তার রিভলভার ডক্টর হাজরার দিকে তাগ করা। বেশ বুঝতে পারছিলাম যে ডক্টর হাজরাই শয়তান, আর তার শাস্তিও হয়েছে চমৎকার, কিন্তু অন্য অনেক কিছুই এখনো এত ধোঁয়াটে রয়েছে যে মাথাটা কেমন জানি গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল।

একটা গাড়ির শব্দ পাওয়া গেল। ডক্টর হাজরা মাটিতে উপুর হয়ে আছেন। তার ঘাড়টা আস্তে আস্তে ফেলুদার দিকে ফিরল, তাঁর বাঁ হাতটা এখন একটা রক্তাক্ত রুমাল সমেত ক্ষতের উপর চাপা।

ফেলুদা বলল, 'আর কোনো আশা নেই জানেন! এবার আপনার দু-দিকের রাস্তাই বন্ধ।'

ফেলুদার কথা শেষ হবার আগেই ডক্টর হাজরা হঠাৎ চোখের পলকে দাঁড়িয়ে উঠে একটা উন্মাদ দৌড় দিলেন উল্টো দিকে। ফেলুদা রিভলভারটা নামিয়ে নিল—কারণ সত্যিই পালাবার কোনো পথ নেই। উল্টো দিক থেকে আমাদের দু'জন চেনা ভদ্রলোক এগিয়ে আসছেন। যার হাতে লাঠি নেই, তিনি খপ করে ক্রিকেট বল লোফার মতো ডক্টর হাজরাকে বগলদাবা করে নিলেন।

এবারে লাঠিওয়ালা ভদ্রলোকটি ফেলুদার দিকে এগিয়ে এলেন। ফেলুদা রিভলভারটা বাঁ হাতে চালান দিয়ে ডান হাতটা ভদ্রলোকের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'আসুন ডক্টর হাজরা।'

অ্যাঁ! ইনিই ডক্টর হাজরা?

ভদ্রলোক ফেলুদার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে বললেন, 'আপনিই তো বোধহয় প্রদোষ মিত্তির?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার নাগরা পরার দরুন ফোসকাটা এখনো সারেনি বলে মনে হচ্ছে...'

আসল ডক্টর হাজরা হেসে বললেন, 'পরশু সুধীরবাবুকে ট্রাঙ্ক কল করেছিলাম। উনিই বললেন আপনি এসেছেন। যা বর্ণনা দিলেন তা থেকে চিনতে কোনো অসুবিধা হয়নি। আলাপ করিয়ে দিই—ইনি হলেন ইন্সপেক্টর রাঠোর।'

'আর উনি?' ফেলুদা হাত-কড়া পরা মাথা হেঁট-করা ময়ূরের ঠোকর-খাওয়া ভদ্রলোকটির দিকে দেখাল। 'উনিই বুঝি ভবানন্দ?'

'ইয়েস', বললেন ডক্টর হাজরা, 'ওরফে অমিয়নাথ বর্মণ, ওরফে দ্য গ্রেট বারম্যান—উইজার্ড অফ দ্য ইস্ট।'

॥ ১২ ॥

ভবানন্দ এখন রাজস্থানী পুলিশের জিম্মায়। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ—ডক্টর হেমাঙ্গ হাজরাকে খুন করার চেষ্টা, তার জিনিসপত্র নিয়ে সটকে পড়া, নিজের নাম ভাঁড়িয়ে হেমাঙ্গ হাজরার ভূমিকা গ্রহণ করা ইত্যাদি। আমরা ডাকবাংলোর বারান্দায় বসে উটের দুধ দেওয়া কফি খাচ্ছি। মুকুল সামনের বাগানে দিব্যি ফুর্তিতে খেলে বেড়াচ্ছে, কারণ সে জানে আজই সে কলকাতা রওনা হবে। সোনার কেল্লা দেখার পর তার আর রাজস্থানে থাকার ইচ্ছে নেই।

ফেলুদা আসল ডক্টর হাজরার দিকে ফিরে বলল, 'ভবানন্দ শিকাগোতে সত্যিই ভণ্ডামি করছিল তো? কাগজে যা বেরিয়েছিল তা সত্যি তো?'

হাজরা বললেন, 'ষোল আনা সত্যি। ভবানন্দ আর তার সহকারী মিলে যে

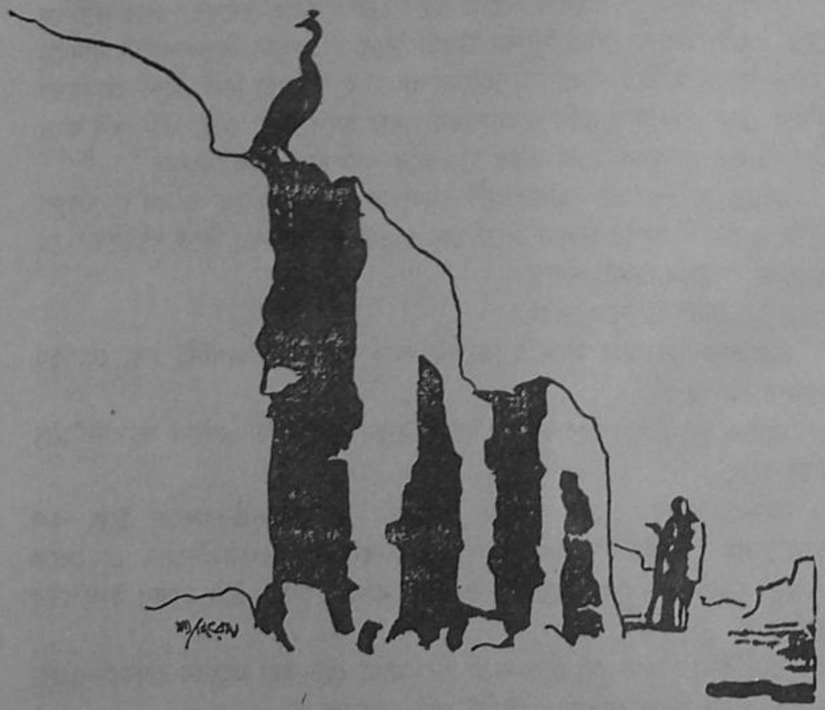





কত দেশে কত কুকীর্তি করেছে তার ইয়ত্তা নেই। তা ছাড়া শিকাগোয় আরো ব্যাপার আছে। নিজের ভণ্ডামির সঙ্গে সঙ্গে আমার মিথ্যে বদনাম রটাচ্ছিল, আমার কাজের বিস্তর অসুবিধা করছিল। কাজেই শেষটায় বাধ্য হয়ে স্টেপ নিতে হল। অবিশ্যি এ হল চার বছর আগের কথা। ওরা কবে দেশে ফিরেছে জানি না। আমি ফিরেছি মাত্র তিন মাস হল। সুধীরবাবুর দোকানে গিয়েছিলাম, সেখানে তার ছেলের কথা শুনে তাকে দেখতে যাই। তার পরের ব্যাপার তো আপনি জানেনই। আমি যখন মুকুলকে নিয়ে রাজস্থানে আসা স্থির করলাম, তখন কিন্তু ভাবতেই পারিনি যে আমার পিছনে লোক লাগবে।'

'এক ঢিলে দুই পাখি কে না মারতে চায় বলুন!' ফেলুদা বলল। 'একে গুপ্তধনের আশা, তার উপর আপনার উপর প্রতিশোধ।...তা, এদের সঙ্গে কলকাতায় দেখা হয়নি আপনার?'

'মোটেই না। প্রথম দেখা হয় একেবারে বান্দিকুই স্টেশনের রিফ্রেশমেন্ট

রুমে। আমি আগ্রায় একদিন থেকে না গেলে ট্রেনে ওদের সঙ্গে দেখা হত না। ভদ্রলোকেরা নিজে থেকে এসে আমার সঙ্গে আলাপ করলেন।’

‘আপনি চিনতে পারলেন না ?’

‘কী করে চিনব ? শিকাগোতে তো এরা ছিলেন একেবারে শ্মশ্রুগুম্ফ সম্বলিত মহাঋষি মহেশ !’

‘তারপর ?’

‘তারপর আমাদের সঙ্গে এক টেবিলে বসে খেলো, ম্যাজিক দেখিয়ে মুকুলের সঙ্গে ভাব জমালো, একই ট্রেনে একই কামরায় উঠল। কিষণগড়ে নেমে মুকুলকে কেল্লা দেখাব সেটা আগেই ঠিক করেছিলাম, কিন্তু এরাও যে আমার পিছু পিছু নেমেছে সেটা জানতে পারিনি। আমি কেল্লায় যাবার কিছু পরেই এরাও পৌঁছেছে। জনমানবশূন্য জায়গা, চোরের মতো এসেছে, আড়ালে আড়ালে তাকে তাকে থেকেছে, সুযোগ পেয়ে পাহাড়ের উপর থেকে ঠেলে ফেলে দিয়েছে। গড়াতে গড়াতে শ’ খানেক ফুট নিচে গিয়ে একটা ঝোপড়ায় আটকে পড়ে বেঁচে



‘সেদিন সার্কিট হাউসের বাইরে তো আপনিই ঘুরছিলেন ?’

‘হ্যাঁ। আর তাতেও তো এক ফ্যাসাদ ! মুকুল দেখি আমাকে চিনে ফেলেছে। অন্তত সেরকম একটা ভাব করেই গেট থেকে বেরিয়ে সোজা আমার দিকে চলে আসছিল।’

‘তারপর আপনি ভবানন্দকে ফলো করে পোকরানের গাড়িতে উঠলেন ?’

‘হ্যাঁ। আর সবচেয়ে মজা—ট্রেন থেকে দেখতে পেলাম আপনারা গাড়ি থামাতে চেষ্টা করছেন।’

‘সেটা নিশ্চয় ভবানন্দও দেখেছিল, আর তাই জেনে গিয়েছিল রামদেওরাতেই হয়ত আমরা ট্রেন ধরব।’

ডক্টর হাজরা বলে চললেন, ‘ট্রেনে ওঠার আগে ত্রিবেদীকে ফোন করে জয়সলমীরে পুলিশকে খবর দিতে বলে দিয়েছিলাম। তার আগেই অবশ্য ওর বাড়ি থেকেই কলকাতায় ফোন করে আপনার আসার খবর পেয়েছি, আর ত্রিবেদীর কাছ থেকে একটি স্যুট ধার করে ভদ্রলোক সেজেছি।’

ফেলুদা বলল, ‘পোকরানে গিয়ে বোধহয় দেখলেন ভবা

'কাগজের ওপরে আপনার নাম ছাপা হয়েছে, তাতে J দিয়ে হাজরা লেখা। আর ইনি নাম সই করেছেন চিঠির নিচে তাতে দেখি Z। তখনই বুঝলাম এ হাজরা আসলে হাজরাই নন। কিন্তু ইনি তাহলে কে? নিশ্চয় যারা কলকাতায় নীলু ছেলেটিকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল তাদেরই একজন। আর অন্যটি হচ্ছেন মন্দার বোস—যার ডান হাতের একটা নখ বড়, আর যার মুখে সিগারের গন্ধ আমিও পেয়েছি, নীলুও পেয়েছে। কিন্তু তাহলে আসল হাজরা কোন ব্যক্তি এবং তিনি এখন কোথায়? এর উত্তর একটাই হতে পারে—হাজরা হলেন তিনিই, যিনি নাগরা পরে পায়ে ফোসকা করেছিলেন, কিষণগড়ে আমাদের কামরায় উঠেছিলেন, সার্কিট হাউসের এবং বিকানির কেল্লার আশেপাশে ঘোরাঘুরি করছিলেন, এবং জয়সলমীরের ডাকবাংলোয় লাঠি হাতে খুঁড়িয়ে হাঁটছিলেন।'

ডক্টর হাজরা বললেন, 'সুধীরবাবু আপনাকে খবর দিয়ে খুবই বুদ্ধিমানের কাজ করেছিলেন, কারণ আমি একা বোধহয় জুত করে উঠতে পারতাম না।ভবানন্দর অ্যাসিস্ট্যান্টকে তো আপনারাই জব্দ করেছেন। এবারে তাঁর হাতেও হাতকড়াটি পড়লেই ষোলো কলা পূর্ণ হয়।'

ফেলুদা লালমোহনবাবুর দিকে দেখিয়ে বলল, 'মন্দার বোসকে প্রথম সন্দেহ করার পিছনে কিন্তু এনার যথেষ্ট কনট্রিবিউশন আছে।'

লালমোহনবাবু এর মধ্যে অনেকবার একটা কথা বলতে চেষ্টা করেছেন কিন্তু পারেননি। এবার তিনি সেটা বলে ফেললেন—

'আচ্ছা স্যার, তাহলে গুপ্তধনের ব্যাপারটা কী হচ্ছে?'

'ওটা ময়ূরে পাহারা দিচ্ছে দিক না!' বললেন ডক্টর হাজরা। 'ওদের বেশি ঘাঁটালে কী ফল হয় সেটা তো দেখলেন!'

ফেলুদা বলল, 'আপাতত আপনার কাছে যে গুপ্তধনটা রয়েছে সেটা তো ফেরত দিন মশাই। অবিশ্যি যেভাবে উঁচিয়ে রয়েছে আপনার কোটটা কোমরের কাছে, তাতে গুপ্ত আর বলা চলে না।'

লালমোহনবাবু বেশ একটু মন-মরা ভাবেই মন্দার বোসের রিভলভারটা বার করে ফেলুদাকে দিয়ে দিলেন।

সেটা হাতে নিয়ে 'থ্যাঙ্ক ইউ' বলেই ফেলুদা হঠাৎ কেমন জানি গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর রিভলভারটা নেড়েচেড়ে দেখল। তারপর বিড়বিড় করে বলল, 'বলিহারি মিস্টার ট্রটার—এভাবে ভাঁওতা দিলেন প্রদোষ মিত্তিরকে?'

'কী ব্যাপার? কী হল?'—আমরা সমস্বরে বলে উঠলাম।

'আরে এ যে একেবারেই ফাঁকি—মেড ইন জাপান—ম্যাজিসিয়ানরা স্টেজে ব্যবহার করে এই রিভলভার!'





সকলে হেসে ফেটে পড়ার ঠিক আগে ফেলুদার হাত থেকে রিভলভারটা নিয়ে দাঁত বার করে জটায়ু বললেন, 'ফর মাই কালেকশন—অ্যান্ড অ্যাজ এ স্মৃতিচিহ্ন অফ আওয়ার পাওয়ারফুল অ্যাডভেঞ্চার ইন রাজস্থান! থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।'